আত্মদর্শন।

শ্রীসীতেশচন্দ্র সান্যাল প্রণীত।

প্রকাশক—মেসার্স সান্যাল এণ্ড কোং,
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৯

মূল্য ৸৹ আনা।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

মাতৃচরণে উৎসর্গ।

মা! আত্মদর্শনের আদি ও মূলে তুমি। দয়া করিয়া তুমি যাঁহাকে আত্মদর্শন করাও, তিনিই আত্মদর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন।

মা! ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে রণভেরির ঘোর নিনাদে মেদিনী যখন কাঁপিতেছিল, সেই সময়ে দিব্যচক্ষুঃ প্রদান করিয়া, তোমার ভক্তসখাকে আত্মরূপ দেখাইয়া, তাঁহার ভেদবুদ্ধি নাশ করিয়া দিয়াছিলে। ইহাতে বুঝিলাম, রণক্ষেত্রই আত্মদর্শন লাভের প্রকৃত ক্ষেত্র, ভক্তসখা হইতে পারিলেই আত্মদর্শন লাভের যোগ্য পাত্র বলিয়া গণ্য কর,—তোমার দয়াই আত্মদর্শনের মূল।

মা! রণক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার সন্তানও উপস্থিত। জীবন সংগ্রামের ভীষণ কোলাহলে চতুর্দ্দিক নিনাদিত। ষড়রিপু কর্ত্তৃক তোমার সন্তান পরিবেষ্টিত। যে অবস্থায় পড়িলে আত্মদর্শন ঘটে—মা, তোমার সন্তানকে সেই অবস্থাপন্ন করিয়াছ—সেই শ্রেয়োমার্গ দেখাইয়াছ।

মা! আশায় বুক বাঁধিয়াছি—দিন গণিতেছি। দয়া করিয়া, যোগ্যপাত্র করিয়া, দিব্যচক্ষুঃ দান করিয়া, যে দিন মনের অভিলাষ পূর্ণ করিবে, সেই শুভ দিনের অপেক্ষা করিতেছি। আজ হউক, কাল হউক, দশ দিন

পরে হউক—জন্ম জন্মান্তর, যুগযুগান্তরে হউক, তোমার কৃপায় আমার বাসনা পূর্ণ হইবে, "তোমার আমার" বোধ বিলুপ্ত হইবে, এই আশা ও বিশ্বাসে, ধীর স্থির চিত্তে, অচল অটল ভাবে, তোমার প্রদর্শিত পথে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি।

মা! যে তোমাকে যে ভাবে ভজনা করে, যে তোমার নিকট যাহা চায়, তুমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাক, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করিয়া থাক—তোমার এই আশা বাণীর প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তোমার শ্রীচরণে, ভক্তি অন্তরে, 'আত্মদর্শন' সমর্পণ করিলাম।

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥

৺কাশীধাম।
রাখীপূর্ণিমা।
১৩১৯।

সীতেশ।

নিবেদন।

"শ্মশান বৈরাগ্য" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। বিষয়ের প্রতি আসক্তি বা অনুরাগ, দুঃখের মূল। বিষয়ের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, তাহার উপর আসক্তি বা অনুরাগ ত্যাগ করিতে যিনি সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। বৈরাগ্য, জ্ঞান লাভের সোপান। জ্ঞান, আত্মদর্শন বা মুক্তিলাভের উপায়। জ্ঞান ব্যতীত আত্মদর্শন ঘটিতে পারে না। কিন্তু আমরা কলির জীব—ঘোর মায়ায় আচ্ছন্ন। অবিদ্যাই আমাদের বিদ্যা। সুতরাং বৈরাগ্য বা জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে। ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে বিদ্যুতের ন্যায় কখন কখন আমাদের চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়, সত্য। কিন্তু তাহা বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী—উদয় ও লয় প্রায় যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। এই ক্ষণিক বৈরাগ্যের নামই শ্মশান বৈরাগ্য।

প্রিয়জনের অভাব হইলে, তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদির জন্য যতক্ষণ আমাদিগকে শ্মশান ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হয়, ততক্ষণই সংসারের অনিত্যতা এবং সংসারের প্রতি একটা ঔদাস্য আমাদের চিত্তে বিদ্যমান থাকে। "হরি তুমিই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা"—এইরূপ কত কথাই তখন আমরা

বলিয়া থাকি। কিন্তু [illegible]
ব্যাখ্যা করিয়া, [illegible] ফিরিয়া [illegible]
সংসারের প্রতি তাঁহারা [illegible]
[illegible] নিয়োজিত হইয়া থাকি, [illegible]
[illegible]
ভাবিয়া থাকে, তবুও থামি না। [illegible]
[illegible] বলিয়াছেন—

দুখ পাওয়ে জো হরি ভজন,
সুখে ন ভজে কোই।
সুখ মে জো হরি ভজে,
দুখ কাঁহাসে হোই?
দুখে সবে ভজে হরি,
সুখে ভজে কবে?
সুখে যদি ভজে হরি,
দুখ কেন হবে?

অনবরত দুঃখ ভোগ না করিলে যখন আমাদের চৈতন্য হইবে না, জ্ঞানের উদয় হইবে না,—সুখের সময় ভগবৎ-চিন্তন, ভগবদারাধনা যখন আমরা করিব না, তখন অনবরত আমাদের দুঃখ ঘটাই মঙ্গল বলিয়া মনে হয়। উক্ত মহাপুরুষও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন—

সুখ মে বাজ পড়ু,
দুখকে বলিহারি যাই।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পাই যে পরম সুখ।

শোক তাপ পাইয়া, মনে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ করি। প্রবন্ধগুলি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। সুখের সময়ে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে, দুঃখ অনুভব করি—দুঃখের সময়ে পাঠ করিলে, শান্তি পাই। আত্মতুষ্টির জন্য, সেই বিকীর্ণ প্রবন্ধগুলি একত্রনিবদ্ধ এবং স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া, এখন পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।

পুস্তকে নূতন কোন কথা নাই—যাহা আছে, সমস্তই পুরাতন। নূতন কথা কোথায় পাইব? জন্ম মৃত্যু— বৃদ্ধি নাশ, ইহাই জগতের নিয়ম। এই অখণ্ডনীয় নিয়ম অনুসারেই আবহমান কাল হইতে সংসার চলিয়া আসিতেছে। এ নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন, কোন ব্যতিক্রম, অদ্যাপি যখন ঘটিল না—কখনও ঘটিবে কি না, সর্ব্বনিয়ন্তাই জানেন—তখন নূতন তত্ত্ব প্রচার করিবার, নূতন আলোক বিকীর্ণ করিয়া জগতকে উদ্ভাসিত করিবার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা নয় কি? আমরা যাহাকে নূতন বলি—যে তত্ত্বকে আবিষ্কার করিয়া,

উদ্ঘাটন করিয়া, নূতন বলিয়া, জগতে প্রচার করি এবং তজ্জন্য আনন্দ, প্রতিষ্ঠা, গৌরব, সম্মান ও অমরত্ব লাভ করি, সে তত্ত্ব প্রকৃতই কি নূতন? আমাদের চক্ষে যাহা নূতন, তাহা কি প্রকৃতই নূতন? যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহাই ব্যক্ত হইল—যাহা অপ্রকটিত ছিল, তাহাই প্রকটিত হইল। বস্তুতঃ পদার্থ ত ছিলই এবং আছে ও থাকিবেও। পদার্থে অনুস্যূত সত্তা লোপ পাইবার নয়, লোপ পাইবে না, কারণ সে যে নিত্য সত্তা, চিরবিদ্যমান—সৎ ও সনাতন। সুতরাং নূতন কিছুই দেখি না, বা দেখাইতে পারি না—যাহা আছে, তাহা পুরাতন। পুরাতন হইলেও আলোচিত কথাগুলি সর্ব্বদাই মনে মনে আলোচনা করা ইষ্টজনক বলিয়া মনে হয়।

দুঃখ পরিহার এবং সুখলাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা জগতে কে না করিয়া থাকেন? জীব অনবরত যে সমস্ত কর্ম্ম করে, সেই সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? কেবল দুঃখ পরিহার ও সুখপ্রাপ্তি। দুঃখ দূর করিতে পারিলেই সুখ প্রাপ্তি ঘটে—সুখপ্রাপ্তি ঘটিলেই দুঃখ থাকে না। ইষ্টলাভ ও অনিষ্টবর্জ্জন, ইহাই ত সুখ। এই সুখ প্রাপ্ত হইলে, দুঃখ থাকিতে পারে না। এই দুঃখ দূর এবং সুখপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে নিত্যবুদ্ধি দ্বারা— অভেদজ্ঞানের সাহায্যে। জগৎ পরমাত্মারই বিকাশ, অভিব্যক্তি, সুতরাং জগৎ নিত্য, অবিনাশী। জগৎ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, কারণ জগৎ

পরমাত্মাসম্ভূত। এই জ্ঞান জন্মিলে সমদর্শন বা আত্মদর্শন লাভ হয়। এই আত্মদর্শনে দুঃখের অবসান, আনন্দের উদয় হয়। এই আত্মদর্শন সম্বন্ধে যথাজ্ঞান, যথাশক্তি কিছু বলিয়াছি। বিষয়টী যেমন গভীর ও কঠিন, বলা বাহুল্য, আমার জ্ঞান ও শক্তিও সেইরূপ ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ।

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।"

যে বুঝিয়াছে জগতের মূলতত্ত্ব, আদিকারণ অজ্ঞেয়, সেই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়াছে। যে মনে করে জগতের মূলতত্ত্ব জ্ঞেয়, সে কিছুই বোঝে নাই- তাহার বুঝিবার শক্তিই নাই। অভিমান শিক্ষার অন্তরায়। যে নিজের অজ্ঞতা উপলব্ধি করে এবং অকপট চিত্তে তাহা স্বীকার করে, জ্ঞানলাভ করা তাহার পক্ষেই সম্ভব। সংসারে জানিবার, বুঝিবার, শিখিবার জিনিষ এত আছে, যে তাহার সহিত যেটুকু আমরা জানিতে, বুঝিতে বা শিখিতে পারিয়াছি, তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে, অভিমান করিবার ত কিছুই থাকে না, অধিকন্তু মনে হয়, 'তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে';—মনে হয় আমরা কিছুই শিখিতে পারি নাই, বর্ণেরই সহিত আমাদের পরিচয় জন্মে নাই, বোধেরই উদয় হয় নাই; মনে হয়, আমরা যে বালক, সেই বালক—যে অজ্ঞ, সেই অজ্ঞ। সুধীজন দয়া করিয়া, আমার অজ্ঞতা অপনোদন করিয়া দিয়া, জ্ঞানানুশীলনে আমাকে প্রোৎসাহিত করিলে, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব।

উপসংহারে বক্তব্য, কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক, আমার পরম শ্রদ্ধেয় সুহৃদ, বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে প্রথিতনামা, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয়, আমার অনুরোধে, অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকখানি আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়া এবং একটী অবতরণিকা লিখিয়া দিয়া, আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

৺কাশীধাম।
১৩১৯।

শ্রীসীতেশচন্দ্র সান্যাল।

সূচীপত্র।

চিত্র।

শুদ্ধিপত্র।

পাঠক, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নের ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৵৹	১১	রণক্ষেত্রে	রণক্ষেত্র
৪	৯	ব্রক্ষ	ব্রহ্ম
৪	১৯	অজ্ঞানবশতঃ	অজ্ঞানবশতঃ।
৬৩	ফুটনোট্	উদ্ধত	উদ্ধৃত

অবতরণিকা।

সংসার রহস্যময়। অসংখ্য, অনন্ত, জীব-নিবহ এই সংসারে কোথা হইতে কয়েক দিনের জন্য আসিয়া, আপনার সুখ-দুঃখে আপনি ভাসিয়া ও অপরকে ভাসাইয়া, চলিয়া যাইতেছে, কে এই রহস্যের উদ্ভেদ করিয়া দিবে? এই খেলারই বা তাৎপর্য্য কি? তুমি, আমি, অপর দশজন—ইহারা কেহই থাকিবে না। ইহারা যাহাদিগকে রাখিয়া যাইবে, তাহারাও কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবে না। সেই মহামহিমান্বিত, "আসমুদ্রক্ষিতীশ", সম্রাট্ অশোক আজ কোথায়? যাঁহার বহু যত্নে সমুৎকীর্ণ, অসংখ্য, ধর্ম্মোপদেশের গাথা-সকল—গ্রামে, নগরে, মনুষ্যালয়ে, নির্জ্জন পর্ব্বতকন্দরে—লোক শিক্ষার নিমিত্ত সদর্পে মস্তক উন্নত করিয়া, একদিন এই ভারতকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল,—সেই অশেষ প্রতাপশালী সম্রাট্ আজ কোথায়? কালের কোন্ কুক্ষি-গহ্বরে তিনি আজ লুক্কায়িত? তাঁহার বংশধরগণই বা আজ কোথায়? কিসের জন্য সংসার? কয়দিনের জন্য সংসার? এই সকল গুরুতর চিন্তা মানুষের মনে সকল দেশে, সকল কালে, সময় সময়, উদিত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সকল চিন্তাকে জীবনের সার করিয়া লইয়া,—এই গূঢ় প্রহেলিকাপূর্ণ জগতের মূল উদ্দেশ্য ও গতি নির্ণয়ের

জন্য জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়া,—প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণে এই ভারতের হিন্দুজাতিই একদিন সমর্থ হইয়াছিল। ব্রহ্মতত্ত্বের আবিষ্কার এবং সেই তত্ত্বকে মনুষ্য জীবনে অনুভব করিয়া, অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া, তদনুসারে আত্মজীবন পুনর্গঠিত করিয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালী,—এই হিন্দুজাতিই আবিষ্কার করিয়াছিল। অপরদেশবাসী-লোকসমূহ হইতে ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে—এই ব্রহ্মপরতাই একদিন পৃথক্ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিদ্যাবত্তা ও ব্রহ্মানুশীলন—ইহাই ভারতের শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের বিশেষত্ব-সূচক লক্ষণ ছিল। ভারতের বৌদ্ধ-ভিক্ষু সম্প্রদায়, শঙ্কর প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসী কুল এবং অদ্য পর্য্যন্ত ভারতীয় গৃহিবর্গের মধ্যে বৈদান্তিক তত্ত্বসমূহের প্রসার ও ব্যাপকতা—এ কথার প্রমাণ দিবে।

সাংসারিকতা, লোককে শিখাইতে হয় না। উহা বহুবর্ষব্যাপিনী সভ্যতারও ফল নহে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার দিন হইতেই মানুষ, ইন্দ্রিয়বর্গকে পাইয়াছে। যাহা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর, তাদৃশ পদার্থরাশি দ্বারা মানুষ, বাল্যকাল হইতেই পরিবৃত। ইন্দ্রিয়বর্গ, আপনার তৃপ্তি আপনি খুঁজিয়া লয়। কিন্তু বিষয়প্রবণ ইন্দ্রিয়বর্গের সংযতশাসন, উহাদিগের যথাযথ বিনিয়োগ, এবং সকলের মূলে এক প্রেরয়িতা পরব্রহ্মের নিয়ত অনুভব,—এগুলি মানুষ জন্ম হইতেই পায় না। ইহাদের জন্য বহুদিবসব্যাপিনী শিক্ষা ও বহুযুগ-ব্যাপী অনু-

শীলনের আবশ্যক। কতযুগব্যাপিনী শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে, ভারতে ব্রহ্মতত্ত্ব উদিত হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? ইহা লাভ করিতে ভারতে কত কোটি কোটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছিল, কে তাহা স্থির করিতে পারে? এই বিশাল শিক্ষা, এই মহান তত্ত্ব, সমগ্র ভারতের জাতিগত, মজ্জাগত সম্পত্তি হইতে কত যুগযুগান্ত অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল, তাহারই বা নির্দ্ধারণ কে করিবে?

একদিন যাহা জাতিগত সম্পত্তিরূপে, ভারতীয় জাতির একটী পরিচায়ক বিশেষ-লক্ষণরূপে,—পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল,—আজ উহা সেরূপে আর ভারতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই—স্বল্প-সন্তুষ্ট ও একনিষ্ঠ, তপশ্চর্য্যা-পরায়ণ ও কর্ম্মময় জীবন, অপিচ সাধন তেজঃসম্পন্ন ও সর্ব্বজনবরেণ্য, ভারতের বিদ্বদ্বর্গ আজ কোথায়? তাঁহা-দিগের তত্ত্ব কথায় ও শাস্ত্র চর্চ্চায়, গ্রাম সমীপবর্ত্তী অরণ্য প্রদেশ সকল, আর আজ মুখরিত হইতে শুনা যায় না। ভারতের গ্রাম, অরণ্য ও গগণ আজ আর ব্রহ্ম-কথায় ও ব্রহ্ম যজ্ঞের ধূমশিখায়—আচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

অপরদেশে যেমন, ভারতেও আজ তদ্রূপ, সাংসারিকতা ও সংসারের কর্ম্মে নিতান্ত ব্যগ্রতা—পুরাকালের ব্রহ্মপরা-য়ণতার আসন শনৈঃ শনৈঃ অধিকার করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। ভারতের সেই মহিমময়, প্রোজ্জ্বল বিশেষ-লক্ষ-ণটী অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। কিন্তু, একদিন যে

শিক্ষা সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না। তাই, আজও বৎসরে বৎসরে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় যে সকল গ্রন্থ বহির্গত হইতেছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মকথা ও ব্রহ্ম-কথার গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। যাহা জাতিগত ছিল, যদিও আজ তাহা ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তির চিত্ত, তত্ত্ব-কথায় ও দার্শনিক-চিন্তায় যত আনন্দ অনুভব করে, সংসারের কথায়, লৌকিক-তত্ত্বের আলোচনায়, তত আনন্দ অনুভব করে না। বোধ করি, ভারতের এই বিশেষত্বটুকু শীঘ্র বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি, স্মরণাতীত কালের সাক্ষ্যস্বরূপ, সেই জাতীয়-সম্পত্তি বুকে লইয়াই,—সেই মহাসাগরের তলদেশ হইতে দুই চারিটী প্রচ্ছন্ন রত্ন আহরণ করিয়া লইয়াই, আজ লোক-লোচনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাচীন ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মকাহিনী এই গ্রন্থে অতি সরল ও সহজ-বোধ্য ভাষায় কথিত হইয়াছে। এই অবতরণিকার প্রথমে যে সকল প্রশ্নের কথা বলিয়াছি, সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা লইয়াই, গ্রন্থখানি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বুঝি বা, দুরন্ত কঠোর ব্রহ্মতত্ত্বগুলিকে এমন সুখ-বোধ্য, সরলভঙ্গীতে, কথারম্ভে কথা কহিয়া, ইতঃপূর্ব্বে, অপর কেহই বলিতে পারেন নাই।

গ্রন্থকার আমার সুহৃদ্। বিশেষতঃ, এই গ্রন্থের হস্তলিপি

আমি আদ্যন্ত দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, পড়িয়াছি। এইজন্য, আমি এই গ্রন্থের উপাদেয়তা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে কুণ্ঠিত। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা উহার বিচার করিবেন। বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকা। আপনাদেরই পূর্ব্বপুরুষবর্গের বহু-যত্নসঞ্চিত রত্নরাজি আদরে বুকে তুলিয়া লইয়া, উহাদিগকে নূতন পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া, আপনাদেরই মায়ের ভাষায়,—আপনাদিগকেই উপহার দিবার উদ্দেশে উৎসুক হইয়া, এই নূতন গ্রন্থখানি—আপনাদের গৃহদ্বারে ভিক্ষার্থীর বেশে আসিয়া দাঁড়াইল।

এইগ্রন্থে, পাঠক-পাঠিকাবর্গ, "মায়া" নামে একটী নাতি-বিস্তৃত প্রবন্ধ দেখিতে পাইবেন। "মায়া" কথাটী ভারতের বড় প্রাচীন সম্পত্তি,—বড় আদরের বস্তু। পৃথিবীর ইতি-হাসে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ, এই শব্দটী সেই গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম স্মরণাতীত কালে ব্যবহৃত হইয়াছিল। অনেক দিন পরে, "ব্রহ্মসূত্রের" ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ভারতের একটী তীক্ষ্ণধী সন্ন্যাসী, ঋগ্বেদের এই শব্দটীরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তদবধি, ইহা ভারতের গৃহে গৃহে, অরণ্যে অরণ্যে, ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। আপনার গৃহচ্ছিদ্র অপরের কাণে তুলিতে নাই, ইহা শাস্ত্রের নির্দেশ। কিন্তু নিজের কথা বলিতে গেলে, বলিতে পারি যে, এই "মায়াই" আমার হস্তে উদ্যম, হৃদয়ে উৎসাহ চক্ষুর কনীনিকা;—উহা না থাকিলে, পলকে আমার প্রলয়

উপস্থিত হয়। কিন্তু কি বলিতে, কি আনিয়া ফেলিলাম !! হায়! মায়া শব্দের কি প্রভাবই এইরূপ ? উহা চিত্তের বিকৃতি উপস্থিত করে, জগতের মূর্ত্তি বদ্‌লাইয়া তুলে। বেদান্তবাদের ইতিহাসে মায়া শব্দটী একটী বিষম প্রহেলিকা হইয়া রহিয়াছে। এই "মায়া" শব্দটীর অর্থ কি ? শঙ্করাচার্য্য জগৎকে মায়াময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, কি এক নিঃশ্বাসে, এত বড় একটী গিরিনদী-অরণ্যানি-সাগর-সমাকুল, বিশাল-বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন ? অথবা এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীটী তত্ত্বদর্শীর চক্ষু দিয়া এই জগৎকে দেখিয়াছেন ? ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তরই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা নাই। ইহাই তত্ত্বদর্শীর অনুভব। গিরি-নদী অরণ্যানী-সাগর উড়াইয়া দিয়া এইরূপ অনুভব করিতে হয় না! এগুলিকে রাখিয়াই, এইরূপ অনুভব জাগরিত হইয়া থাকে। একই বস্তু, স্বরূপতঃ স্থির থাকিয়া, বিবিধ রূপান্তর ধারণ করিয়া, বিবিধ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, আমরা ঋগ্বেদে, "মায়া" শব্দের এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাই। শঙ্করাচার্য্য যে বেদবিরুদ্ধ ব্যাখ্যার আদর করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রের ভাষ্যে, শঙ্করাচার্য্য ঋগ্বেদের প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে মায়া শব্দের ব্যাখ্যায় ঋগ্বেদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, আমার ইহাই ধারণা ও বিশ্বাস। "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থে আমি

ইহা বিস্তৃত ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই বর্ত্তমান গ্রন্থের "মায়া" নামক প্রবন্ধে, এই গ্রন্থপ্রণেতার মত ও সিদ্ধান্তও পাঠক দেখিতে পাইবেন। সমগ্র বেদান্ত মতটাই এই মায়া শব্দের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাই, এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক মনে করিলাম। অলমতিবিস্তরেণ।

কোচবিহার।
ভিক্টোরিয়া কলেজ।
মাঘ, ১৩১৯।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

আত্মদর্শন।

—:০:—

জ্ঞানেই আনন্দ।

মা কাঁদ্‌চে কেন, বাবা?

অম্‌নি, ও কিছু নয় মা। এই বলিয়া পিতা মুখ ফিরাইলেন।

খোকা কোথা, বাবা? মা যে খোকা খোকা বলে কাঁদ্‌চে। মাকে কাঁদ্‌তে দেখলে আমারও কাঁদ্‌না আসে।

পিতা এবার নির্ব্বাক, নিরুত্তর—অবনত মস্তক, সজল-নয়ন—উদ্বেলিত হৃদয়।

কথা যে বল্‌চ না, বাবা! ঐ যে তুমিও কাঁদ্‌চ। মাও কাঁদ্‌চে, তুমিও কাঁদ্‌চ, আমার কি হবে, বাবা? কি হয়েচে, বলো না।

মারে হবে আর কি, খোকা আর নাই। আমার প্রাণ শূন্য ক'রে, খোকা কি জানি কোথা চ'লে গেছে।

তার জন্য কাঁদ্‌চ কেন, বাবা? খোকা ত এখুনি আস্‌বে।

খোকাকে আর পাব না, মা—জন্মের মত তাকে হারিইচি।

খোকা কি তবে আমাদের সঙ্গে খেলা কর্‌তে আর আস্‌বে না? খোকা, ইন্দু, আমি—তিন জন এক সঙ্গে খেলা করি। খোকা না এলে খেলায় আমার মন বসে না। আমি তাকে ডেকে আনি, বাবা?

বলিস্‌ কি মা, যাবি কোথা? তোর প্রাণের ভাইয়ের সঙ্গে তোর খেলা জন্মের মত ফুরিয়েচে। আর সে সাধ করিস্‌ নে মা।

কন্যা কাঁদো কাঁদো মুখে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। পিতাও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

কন্যা দুইটীর মধ্যে একটীর নাম হেমলতা, অপরটীর নাম শরদিন্দু। হেমলতার বয়ঃক্রম ছয়বৎসর, ইন্দুর বয়ঃক্রম চারি বৎসর।

নিভৃত গৃহে একাকী বসিয়া পিতা ভাবিতে আরম্ভ করিলেন—মা হেমি, তুই সুখী। যে জ্বালায় তোর গর্ভধারিণী ও আমি এখন দগ্ধ হইতেছি, মা তার কারণ তুই এখনও কিছুই জানিস্‌ না। আমাদের কি যে ভয়ানক সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, মা এখনও তুই তা বুঝিস্‌ না। যাহা স্বপ্নের অগোচর, চিন্তার বহির্ভূত, কল্পনাতীত—মা তাহাই আমাদের ঘটিল, তুই কিন্তু তা বুঝ্‌লি না। তুই খাস্‌ দাস্‌, বেড়াস্‌, খেলা করিস্‌—যা খুসি তাই করিস্‌, কোন

ভাবনা নাই, চিন্তা নাই—সদা হাস্যময়ী, আনন্দময়ী—কেন তুই এ লোকের কেউ নয়, তাই এ সব ধারণা করতে পারিস্ না। মা, তুই সুখী। তুমুল তুফান আমাদের সর্ব্বস্ব উড়াইয়া লইয়া গেল, মহাকাল আমাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া ফেলিল, মা তুই তা দেখ্‌লি না। মহাপ্রলয়ে তোর পিতা-মাতার সর্ব্বস্ব নিমজ্জিত হইয়া, পুনরায় তাঁহাদের পক্ষে এই এক নূতন সংসারের সৃষ্টি হইল—মা ইহার বিন্দু বিসর্গও তুই জান্‌লি না। মা তুই সুখী। তুই এ সমস্ত জানিস্ না, বুঝিস্ না বলেই সুখী। কিন্তু এ সুখ আর তোর অধিক দিন ভোগ কর্‌তে হবে না, মা। বয়েস হউক, তখন আপনি সমস্ত বুঝ্‌বি—বুঝে কাঁদ্‌বি।

বুঝে কাঁদ্‌বি? কি ভয়ানক কথা। আমরা বয়স্ক, সমস্ত বুঝি—তাই জন্যই কি কাঁদি? বুঝ্‌লে কাঁদ্‌বো কেন? বুঝ্‌লে বরং না কাঁদ্‌বারই কথা। বুঝ্‌লে সুখের উদয় হয়। সুখ কাঁদিবার হেতু হইতে পারে না। তবে কি আমরা প্রকৃতই বুঝি? যে যাহা, অথবা যে যদ্‌গুণবিশিষ্ট, তাহাকে তদাকারে চিত্ত যদি ধারণা করিতে সমর্থ হয়,তাহাকে বুঝা বলে। রজ্জুকে যদি রজ্জু বলিয়া চিত্ত ধারণা করিতে সমর্থ হয়,তবে রজ্জু পদার্থ বুঝা গেল। রজ্জুকে রজ্জু অতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু বলিয়া চিত্ত যদি ধারণা করে, তাহা হইলে রজ্জু পদার্থ বুঝা গেল না। অগ্নিতে দাহিকা ও প্রকাশিকা গুণ আছে, চিত্তে এই ধারণা হইলে অগ্নি পদার্থ বুঝা যায়—

এই ধারণা না হইলে, অগ্নি পদার্থ বুঝা যায় না। সুতরাং চিত্তে বস্তুর প্রকৃত গুণের ধারণা হইলেই, সেই বস্তু প্রকৃতরূপে বুঝা যায়—অর্থাৎ পদার্থের প্রকৃতি ধারণা, জ্ঞান।

জ্ঞান দ্বিবিধ,—সত্য বা নিত্য জ্ঞান, অসত্য বা অনিত্য জ্ঞান। সত্য বা নিত্য বস্তুর তদাকার জ্ঞান, সত্য জ্ঞান বা নিত্য জ্ঞান। অসত্য বা অনিত্য বস্তুর তদাকার জ্ঞান, অসত্য বা অনিত্য জ্ঞান। জ্ঞানের সত্যাসত্য ও নিত্যানিত্য, বস্তুর সত্যাসত্য ও নিত্যানিত্যে। নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, সত্য ও নিত্য জ্ঞান,—অনিত্যা পৃথিবী বিষয়ক জ্ঞান, অনিত্য জ্ঞান, যেহেতু পৃথিবীর নাশের সহিত তদ্বিষয়ক জ্ঞানও নাশ পায়। পৃথিবী পরিণামী। যাহা পরিণামী, তাহা অনিত্য। সুতরাং এ পৃথিবী অনিত্যা। অনিত্যা পৃথিবী সম্বন্ধীয় জ্ঞানও সুতরাং অনিত্য। ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে আমরা কিছুই বুঝি না। সুতরাং আমরা কাঁদি, না বুঝিয়া—অজ্ঞানবশতঃ।

অজ্ঞান তবে ক্রন্দনের হেতু, অশান্তির মূল। যে যাহা নয়, বা যাহা যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলিয়া বুঝি—তাহার প্রতি বিপরীত গুণ, বিপরীত স্বভাব আরোপ করি,—প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে, ঘোর অজ্ঞান বশতঃ। এই বিপরীত গুণ আরোপ করি বলিয়াই যত দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিয়া থাকি। এই অশান্তি বিদূরিত হইতে পারে, অজ্ঞান বিদূরিত হইলে এবং প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে।

চিত্ত শূন্য ও নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। যাবৎ চিত্তে অদ্বৈতভাব সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না হয়—যাবৎ জীব মায়ারে আচ্ছন্ন, কর্ম্মবন্ধনানুবদ্ধ, বিষয়কীট, তাবৎ চিত্তে চিন্তা বিদ্যমান। সচ্চিন্তাই হউক, আর অসচ্চিন্তাই হউক, কোন না কোন চিন্তা চিত্তে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। চিন্তা কর্ম্মের মূল ও প্রবর্ত্তক। চিন্তা হইতেই কর্ম্মের সৃষ্টি। কর্ম্ম চিন্তানুরূপ। সদসৎ কর্ম্ম—সদসৎ চিন্তার ফল। সৎকর্ম্ম সচ্চিন্তা বা জ্ঞানমূলক—অসৎকর্ম্ম অসচ্চিন্তা বা অজ্ঞান-মূলক। অজ্ঞান অন্তর্হিত হইলে জ্ঞান তৎস্থান অধিকার করে। ছায়া যেরূপ পদার্থকে অনুগমন করে, অন্ধকার যেমন আলোককে অনুগমন করে, অজ্ঞানও তদ্রূপ জ্ঞানকে অনুগমন করে। আবার পদার্থ যেমন ছায়াকে অনুগমন করে, আলোক যেমন অন্ধকারকে অনুগমন করে, জ্ঞানও তদ্রূপ অজ্ঞানকে অনুগমন করে। সৃষ্টি যখন অনাদি অনন্ত, তখন কার্য্যকারণভাব হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ,—হাসির পর ক্রন্দন, ক্রন্দনের পর হাসি, ইহা জগতের রীতি। ইহাই যখন জগতের রীতি, অখণ্ডনীয় নিয়ম, তখন যে নিত্য সুখের জন্য জীব সতত সমুৎসুক, তাহা ত দুষ্প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়। চক্রবৎ সংসা-রের পরিধিতে যাবৎ বাস, তাবৎ এইরূপ অনুমান হইবে। কিন্তু কেন্দ্রীভূত হইবার প্রয়াস যতই বৃদ্ধি পাইবে, এ ধারণা ততই অপসারিত হইবে। কেন্দ্রীভূত হইবার নিমিত্ত

শিবপন্থা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু আমরা অন্ধ, সে পথ আমাদের নয়নগোচর হয় না,—অথবা দেখিয়াও দেখি না। যে পথের পথিক হইবার নিমিত্ত অমরগণও লালায়িত —ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, গৌতম, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক মহাত্মাগণ দেবতা ভিন্ন আর কেহই নন্;—যে পথের পথিক হইবার নিমিত্ত নিষ্প্রয়োজন সত্ত্বেও, অথবা লোক শিক্ষার্থে, স্বয়ং ভগবান বারম্বার নানারূপে অবতীর্ণ হন, সেই প্রশস্ত শিবপন্থার পথিক হইতে আমরা উদাসীন, নিরুদ্যম, শিথিলপ্রযত্ন! যাহারা ঘোর কর্ম্মবন্ধনানুবদ্ধ, জন্মমৃত্যুভয়সঙ্কুল, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন, তাহারা এই শিব-পন্থার পথিক হইতে নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম, নিরুৎসাহী! যাহাদের এ পথ ভিন্ন আর পথ নাই, উপায় নাই—যাহাদের জন্যই এ পথ নির্ম্মিত, তাহারাই এ পথের পথিক হইতে পরাঙ্মুখ! অহো কি বিড়ম্বনা, কি ঘোর অজ্ঞান!

এই অজ্ঞানই ত যত অনিষ্টের মূল। এই অজ্ঞা[illegible] ত দেহীকে কখন হর্ষোৎফুল্ল, কখন বা শোকসন্তপ্ত [illegible]য়া থাকে। এই অজ্ঞানই ত দেহীকে কর্ম্মসূত্রে জড়ীভূত করি-তেছে—ফলতঃ এই অজ্ঞানই কর্ম্মের মূল,যাতায়াতের কারণ। অতএব এই অজ্ঞানকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিতে পারিলে মঙ্গল। বৃক্ষে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তারপর যত উচ্চে উঠা যায়। এক দিনের চেষ্টায় শিখর দেশে উঠা অসম্ভব—এক জন্মের চেষ্টায় অজ্ঞান দূর ও

জ্ঞান লাভ হয় না। প্রতি জন্মেই কিছু কিছু করিয়া অজ্ঞান বর্জ্জন এবং জ্ঞান অর্জ্জন করিলে, কালে স্থিরজ্ঞান লাভ হইতে পারে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞান এবং অভ্যাসের সাহায্যে, অথবা পূর্ব্বসংস্কার দ্বারা, মায়ামুক্ত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারা যায়।

অজ্ঞান মায়ার নামান্তর। দেহ প্রভৃতি অনিত্য বস্তুর সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞান—অর্থাৎ দেহই আত্মা, আত্মাই দেহ, এই অবিদ্যা বা বিপরীত জ্ঞান দুঃখের নিদান এবং আনন্দের অন্তরায়। আমরা যদি বুঝি, অন্ততঃ বুঝি-বার ইচ্ছা ও চেষ্টাও করি যে, দেহ ও ইন্দ্রিয় আত্মা নয়, দেহ ও ইন্দ্রিয় বিনাশশীল, কিন্তু আত্মা নিত্য, অবিনাশী; আমরা যদি বুঝি, অন্ততঃ বুঝিবার ইচ্ছা ও চেষ্টাও করি যে—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥

(গীতা ২—২৩, ২৪, ২৫)

অর্থাৎ শস্ত্র আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি আত্মাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল আত্মাকে ক্লিন্ন

করিতে পারে না, বায়ু আত্মাকে শোষণ করিতে পারে না, যেহেতু আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য; আত্মা নিত্য বস্তু, সর্ব্বব্যাপী, স্থাণু অর্থাৎ স্থির স্বভাব, অচল, অনাদি, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার, অতএব আত্মাকে এবম্ভূত জানিয়া তুমি শোক করিতে কখনই যোগ্য হও না;—তাহা হইলে দেহের প্রতি আত্মার অভিমান জন্মিতে পারে না, দেহকে আত্মা বলিয়া ধারণা হইতে পারে না, দেহ ও আত্মা পৃথক বলিয়া চিত্তে প্রতিভাত হইতে পারে। তখন দেহে আত্মাভিমান নিবৃত্ত হয় এবং দুঃখের কারণ, অশান্তির হেতু, তিরোহিত হয়। তখন স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ক্ষেত্রাদির বিনাশ হইলে শোকবিহ্বল হইতে হয় না, কারণ তত্ত্বজ্ঞান—বস্তুর স্বরূপ বা স্বভাববোধ, তখন অজ্ঞানকে দূর করিয়াছে এবং মোক্ষলাভের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে।

অতএব হে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর! আমায় সুমতি প্রদান কর। অসার সংসারের অনিত্য সম্বন্ধে অনুবদ্ধ হইয়া তোমার চরণচ্যুত যেন না হই। মায়াময় জগতের অলীক মৃগতৃষ্ণায় কাতর হইয়া অতল কর্ম্মজলধিজলে যেন নিপতিত ও নিমজ্জিত না হই। যেখানে যখন যে ভাবেই থাকি না কেন—সুখসাগরে বা দুঃখার্ণবে—বাহ্য বস্তুর বিশ্ব-বিমোহন বিভায় বিগলিত চিত্ত না হইয়া, অনন্তশক্তি অন্তরাত্মার অনুজ্ঞানুযায়ী ক্রিয়াশীল যেন হই। হে শরণদ! এ

শরণাপন্ন অধমকে সৎসঙ্গ প্রদান কর। যেখানে চিত্ত বিকারের সম্ভাবনা নাই, অভীষ্ট অসিদ্ধির আশঙ্কা নাই, নিরুৎসাহ করিবার কারণ নাই—সেই পুণ্যস্থান, পবিত্রসঙ্গ, মহদাশ্রয় প্রদান কর। যেখানে জগতের কোলাহল, মায়ার হলাহল, সংসারের দাবানল, শ্মশানের চিতানল নাই—সেই পুণ্য পবিত্র নিকেতন, সেই শান্তিধামে স্থান দেও। হে প্রভো! তুমি নিত্য নিরঞ্জন, অখিল কারণ, ভয় বিনাশন; তুমি পতিতপাবন, অধমতারণ, দুঃখবিমোচন; তুমি নির্ব্বিকার, নিরাকার, পরাৎপর; তুমি ক্ষমাশীল, দীনদয়াল, শরণাগতবৎসল; তুমি অগতির গতি, অভরসার ভরসা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়; তুমি দয়াময়, করুণাময়, মঙ্গলময়; তুমি ইচ্ছাময়, লীলাময়, জ্ঞানময়। তোমার নাম স্মরণমাত্র, তোমার চরণ ধ্যানমাত্র জীবের পাপতাপ, আধিব্যাধি, দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অশান্তি বিদূরিত হইয়া, পরমানন্দ লাভ হয়। তোমার নামের গরিমা, তোমার চরণের মহিমা—ক্ষুদ্রচেতা, অল্পবুদ্ধি,মূঢ়মতি ধারণা বা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। সে বাক্‌বিভব নাই, সে রচনাকৌশল নাই, সে ভক্তি অনুরাগ নাই, সে জ্ঞান গবেষণা নাই, যাহার সাহায্যে তোমার স্তব, স্তুতি ও গুণ গান করিয়া, নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি। যতই বলি না কেন, মনে হয় কিছুই বলা হইল না;—যতই তোমার ধ্যান করি না কেন, মনে হয় ধ্যানে বুঝি তোমায় আনিতে পারিলাম না,—যতই তোমায় ডাকি না

কেন,মনে হয় ডাকের মত ডাক বুঝি ডাকিতে পারিলাম না। হে অন্তর্যামী অন্তরাত্মন্! তুমি আমার হৃদ্‌গত সমস্ত ভাব জান, সমস্ত ভাব বুঝ, সমস্ত ভাব দেখ। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর—তোমার অভয়পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলাম।

নিভৃত গৃহে পিতা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,এমন সময়ে কন্যা হেমি দ্বারস্থা হইয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল—বাবা, বাবা, দ্বার খোল। পিতা দ্বার খুলিলেন, কন্যা গৃহে প্রবেশ করিল। পিতার সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিয়া কন্যা জিজ্ঞাসা করিল—এই কতকক্ষণ হইল, তুমি কাঁদ্‌চিলে, এখন হাস্‌চ যে, বাবা?

পিতা বলিলেন—বুঝ্‌লে কাঁদ্‌না পায় না, মা, আনন্দের উদয় হয়। জ্ঞানেই আনন্দ।

মায়া।

সংসার চক্রের ঘোর নিস্পেষণে নিস্পিষ্ট হইয়া মানব-হৃদয় যখন বিচলিত হইয়া পড়ে, মায়াময় জগতের ঘোর মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া মানবচিত্ত যখন জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া পড়ে, কাম ক্রোধাদি দুর্দ্দান্ত দানবদলের দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে জগৎ যখন ভীত, চকিত, স্তম্ভিত—জীবজগতের সেই বিকট, বিভীষণ আকার মনে উদিত হইলে কম্পিত কলেবর, স্তিমিত

লোচন, ভয়বিহ্বল হইতে হয়। ইহা সংসারের বিধিনির্ব্বন্ধ নিয়ম কি না জানি না—দুরধিগম্য ঐশ্বরিক অভিপ্রায় চিন্তার বিষয়ীভূত করিবার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্তু সর্ব্বত্র, সতত, যেন আসন্ন বিপদ, যেন হতাশের আক্ষেপ, যেন হা হতোস্মি, হা দগ্ধোস্মি, এইরূপ কাতর ধ্বনি কর্ণগোচর হয়। এই বিলাপের প্রকৃত কারণ যথাসাধ্য অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

জননী জঠরে ক্রমে নবম মাসে পদার্পণ করিয়া গর্ভযন্ত্রণা অসহিষ্ণু জীব খেদ করিয়া থাকে—পূর্ব্বজন্মে আমি কত মহাপাপ করিয়াছি তাহার সীমা নাই, নতুবা গর্ভে আবার আমার প্রবেশ কেন, এ দুঃসহ যন্ত্রণাই বা আমি কেন ভোগ করি? যাহা হউক, ভূমিষ্ঠ হইলে, সংসারে প্রবেশ করিলে, গুরূপদেশ অনুযায়ী এবার সতত সচ্চিন্তায় নিমগ্ন রহিব, সৎকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিব, সৎপথে বিচরণ করিব—মা ভগবতীর প্রসন্নতা লাভে যত্নবান হইব। পুত্র, কলত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, সম্পত্তি, ইহাদেক অলীক, অনিত্য জানিয়া, সেই নিত্যা, শুদ্ধা, বুদ্ধা, মুক্তা মহেশ্বরীর শ্রীপাদপদ্ম সেবাপরায়ণ হইব। আত্মগ্লানি নিবন্ধন এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে করিতে, জীব যথাকালে ভূমিষ্ঠ হয়। হইবামাত্র অব্যবহিত পূর্ব্বকালের সৎপ্রতিজ্ঞাগুলি সে ভুলিয়া যায়। মহামায়ার মহামায়াজালে নিক্ষিপ্ত হইয়া জীব প্রত্যক্ষকে স্বপ্ন, স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ ভাবে; নিত্য, সত্য, তাহার নিকট অনিত্য, অসত্য,

বলিয়া প্রতীয়মান হয়,—অনিত্য, অসত্য, নিত্যসত্য রূপে তাহার নিকট সমাদৃত হয়। মায়ার আবরণ, অর্থাৎ অজ্ঞান, পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ জীবের নয়নবহির্ভূত করে। প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে না পারিলে,—বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিলে, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান লোপ পাইলে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক্কচিৎ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, অকর্ত্তব্য কর্ম্মই প্রায় অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং পাপস্রোত প্রখর বেগে প্রবাহিত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই—গর্ভস্থিত জীব ভূমিষ্ঠ হইলে সদাচারী হইবে, এই সঙ্কল্প করিয়া যথাকালে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র, মহামায়ার মহামায়ায়ে সমস্ত বিস্মৃত হয়—অর্থাৎ সৎকর্ম্ম করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও, মহামায়ার মায়া নিবন্ধন, জীব সৎকর্ম্ম না করিয়া অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তবে কি অসৎকর্ম্ম মহেশ্বরীর অভিপ্রেত? অভিপ্রেত হইলে দণ্ডার্হ কেন? আর যদি দণ্ডার্হ হয়, তবে নিশ্চয়ই অভিপ্রেত নয়। এ বড় বিষম সমস্যা, সামান্য বুদ্ধির অগম্য, সুতরাং সন্তোষজনক মীমাংসায় আসা অসম্ভব—অথচ মীমাংসার বিলক্ষণ প্রয়োজন, যেহেতু এই ঘোর সন্দেহ প্রাগুক্ত সকাতর আর্ত্তনাদের এক কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। সৎকর্ম্মপরায়ণ হই... চিত্তশুদ্ধি ও সুখ প্রাপ্তি হয়, সত্য। যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তি ক্রমশঃ প্রগাঢ়তর হইতে থাকে, ভক্তি জ্ঞানের কারণ, জ্ঞান মুক্তির হেতু, ইহাও সত্য। কিন্তু এই মহাবাক্য ও সদুপায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও

জীব যখন কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদাসীন, অকর্ত্তব্য কর্ম্মে তৎপর, তখন ইহাই মনে হয় যে, জ্ঞানশক্তি অপেক্ষা মায়াশক্তি প্রবলতর পরাক্রমশালিনী। যেমন উচ্ছ্রিত পদার্থকে আকর্ষণীশক্তি স্বকীয় প্রভাব দ্বারা নিম্নস্থ করে, মায়াও তদ্রূপ সমুন্নত জীবকেও স্বীয় প্রভাব দ্বারা বিকলচিত্ত করিয়া নিজকুক্ষিগত করিয়া থাকে। সুতরাং মহামায়ার মায়াই সমস্ত অনিষ্টের মূল। মায়া নিবন্ধন জ্ঞান তিরোহিত হয়। জ্ঞান তিরোহিত হইলেই অনিষ্টাচরণ অনুষ্ঠিত হয়। তাই জিজ্ঞাস্য—অসদাচরণ মহেশ্বরীর কি অনুমোদিত বা অভিপ্রেত ?

চিত্তে অশান্তির অপর কারণ সৃষ্টি প্রকরণের উপকরণ। সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয়ের সাম্যভাব প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত তত্ব, মহত তত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চমহাভূত হইতে এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাগুক্ত গুণত্রয় কিন্তু এই সৃষ্টির মূলে বিদ্য-মান। এই গুণত্রয় মধ্যে যে যদ্রূপ প্রভাববিশিষ্ট, সৃষ্ট বস্তুও তদ্ভাবাপন্ন হইবে। "সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টং"। সত্ত্বগুণ লঘু অর্থাৎ অনালস্য, অপ্রমাদ প্রভৃতির কারণ ও জ্ঞানের সাধন, সুতরাং সুখকর। "উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ"। রজোগুণ কার্য্যপ্রবর্ত্তক এবং চাঞ্চল্য সাধন, ক্রোধ, অভিমান উত্তেজক, পরশ্রীকাতর, সুতরাং

দুঃখকর। "গুরুবরণক মেবাং তমঃ"। তমোগুণ থাকিলে জড়তা, আলস্য ও মনোবৃত্তিনিচয়ের অবসাদ জন্মিয়া থাকে, সুতরাং উহা দুঃখকর। গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্ব সুখাবহ, রজঃ ও তমঃ দুঃখদায়ক। সুতরাং সৃষ্টির মূলে, অর্থাৎ প্রাগুক্ত গুণত্রয়ের মধ্যে, কেবল একটী গুণ সুখকর ও অপর দুইটী গুণ দুঃখকর ও চাঞ্চল্য উৎপাদক বিদ্যমান আছে বলিয়া, এ জগতে দুঃখেরই প্রাবল্য আছে, এইরূপ প্রতীত হয়।

এই সুখ দুঃখ কি, এবং কি উপায়ে সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ পরিহার সম্ভব হইতে পারে, ইহা স্থির করা সুকঠিন, যেহেতু ইহা পরিমার্জ্জিত জ্ঞান, গভীর গবেষণা ও পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কার ও পুণ্যফল সাপেক্ষ। এখন প্রশ্ন, সুখ কি? "সুখং অনুকূল বেদনীয়ং"। অভীপ্সিত পদার্থ প্রাপ্তি পক্ষে যাহা অনুকূল, তাহাই সুখ। আত্মতত্ত্ব, আত্মার স্বরূপ, আত্মবিষয়ক জ্ঞান—জীব ইহারই অনুসন্ধিৎসু। আত্মতত্ত্ব কি? পরম পুরুষ পরমাত্মা নির্গুণ, সুতরাং অকর্ত্তা ও অবিকার। তিনি দেহস্থ হইলেও, দেহজ সুখ-দুঃখাদিতে নির্লিপ্ত। বিশ্বাকাশ ও ঘটাকাশে যেমন প্রকৃত-পক্ষে কোন পার্থক্য নাই—বিশ্বাকাশ ঘটমধ্যগত হওয়া নিবন্ধন, ঘটস্বভাববিশিষ্ট যেমন হয় না, পরমাত্মা ও জীবা-ত্মাতেও তদ্রূপ কোন প্রভেদ নাই—দেহস্থ হইলেও পর-মাত্মার স্বকীয় স্বভাবের কোন বৈলক্ষণ্য বা পরিবর্ত্তন ঘটে না। প্রকৃতির সংসর্গনিবন্ধন পরমাত্মা অহঙ্কারবশতঃ

"আমি কর্ত্তা" এইরূপ অভিমান করাতে তাঁহাকে সদসৎ কর্ম্মদোষে লিপ্ত, সুতরাং সংসারী হইতে হয়, সত্য। কিন্তু তথাপি পরমাত্মার এই বিকার দৃশ্যতমাত্র, যথার্থতঃ নয়। অজ্ঞানী ইহাকে বিকার বিবেচনা করিতে পারে, জ্ঞানীজন পরমাত্মার বিকার কল্পনা করিতে পারেন না। দৃষ্টিদোষ নিবন্ধন পদার্থের প্রকৃত স্বরূপের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। দৃষ্টিদোষনিবন্ধন রজ্জুকে আমি সর্প সিদ্ধান্ত করিলে রজ্জু সর্প হইবে না, যে রজ্জু সেই রজ্জুই রহিবে। সুতরাং প্রকৃতির সংসর্গে পরমাত্মার বাস্তবিক কোন বিকার ঘটে না, অপিচ পরমাত্মা যেমন নির্গুণ, অবিকৃত, সংসর্গ সত্ত্বেও তদ্রূপ নির্গুণ, অবিকৃত থাকেন। শ্বেত, স্বচ্ছ, নির্ম্মল স্ফটিক, নীল, পীত ইত্যাদি বর্ণ সন্নিধানে নিজেও যেমন তদাকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, অথচ তত্‌ তত্‌ সংসর্গ-চ্যুত হইলে তাহার স্বাভাবিক শ্বেত, স্বচ্ছ বর্ণ প্রকাশ করে, প্রকৃতি সংসর্গে পরমাত্মারও তদ্রূপ বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে, অথচ বস্তুতঃ পরমাত্মা নিত্য, নির্গুণ, অকর্ত্তা, অবিকারী। ইনি কার্য্য কারণ সকলের মধ্যেই অনুস্যূত আছেন এবং আপনি পরিপূর্ণ স্বরূপ। স্ব স্ব দেহের মধ্যবর্ত্তী হৃদয়দেশে প্রাদেশ পরিমিত স্থানে যিনি বাস করিতেছেন, তিনিই আত্মা, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই নারায়ণ।* আত্মার এই

* অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

(কঠোপনিষৎ)

তত্ত্ব, এই স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত জীব সতত ব্যাকুল, হৃদয়-স্থিত আত্মারাম পুরুষের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন নিমিত্ত জীব সর্ব্বদা সমুৎসুক, তদ্দর্শনজনিত পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত নিয়ত লালায়িত। অবিচলিত বৈরাগ্য, প্রগাঢ় ভক্তি, তন্ময়চিত্ততা —ইহাই পূর্ণানন্দলাভের প্রশস্ত উপায়। যাবৎ অজ্ঞান বা মায়া চিত্ত হইতে অপসৃত না হইবে, তাবৎ জীবের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং "সুখং অনুকূল বেদনীয়ং" এই বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া, আমরা মায়াজ্ঞানাভাবকেই সুখ বলি—অর্থাৎ যাঁহাতে মায়ার কোন প্রভাব বা আধিপত্য নাই, এইরূপ একটা স্থির দিব্যজ্ঞানেতেই সুখ।

মানুষের আশ্রয় দ্বিবিধ—মায়া ও জ্ঞান। এই দুই বস্তুর একত্র সমাবেশ অসম্ভব। এই দুই বস্তু একত্র, একসঙ্গে থাকিতে পারে না, কারণ দুইটীই পরস্পর বিরোধস্বভাব বিশিষ্ট। মায়াবিমুগ্ধচিত্ত ভগবচ্চরণান্তরিত, মায়াবিমুক্তচিত্ত ভগবচ্চরণপ্রান্ত। মায়াতে যিনি অভিভূত, প্রকৃত ভগবচ্চিন্তন তাঁহার পক্ষে সুদূরপরাহত। মায়াকে মলিন বসন জ্ঞানে ত্যাগ করিতে যিনি সমর্থ, তিনি ভগবন্নারায়ণ-সন্নিধানে অবস্থিত। ভগবদ্দর্শন, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন, তাঁহার পক্ষে সম্ভব। মায়াবিমুগ্ধচেতা অসার কর্ম্মে রত। অসার কর্ম্ম দুঃখদায়ক—অথবা কর্ম্ম, জন্মমৃত্যু, যাতায়াত, সুখ দুঃখের হেতু। সেই কর্ম্মের মূল মায়া।

এখন মায়া কি? মায়া বলিলে কি বুঝি? যাহার প্রকৃত

স্বরূপ বুঝিতে পারি না—সৎ কি অসৎ—অথবা সদসতের মধ্যস্থিত কোন অনির্ব্বাচ্য অবস্থা, তাহাই মায়া। যাহা থাকে না—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে যাহার অস্তিত্ব নাই, যাহা মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়—যাহা বস্তু কি অবস্তু, সৎ কি অসৎ, সাকার কি নিরাকার, কিছু বলিয়া যখন অবধারণ করিতে পারি না, তখন তাহা অনির্ব্বাচ্য। এই অনির্ব্বাচ্য ভাবই মায়া বা অজ্ঞান।

জ্ঞানের অভাব কিন্তু অজ্ঞান নয়। অজ্ঞান বলিলেই জ্ঞান আসিয়া পড়ে—না আসিয়া পারে না। 'আমি অজ্ঞানী' ইহা বলিলেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আপনি প্রমাণ হয়। আমার অন্য কোন জ্ঞান না থাকুক, আমি যে অজ্ঞানী, অন্ততঃ সে জ্ঞানটুকু ত আমাতে আছে।

সতের অভাব অসৎ নয়। অসৎ বলিলেই সৎ আসিয়া পড়ে—না আসিয়া পারে না। 'এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অসৎ' বলিলেই সতের প্রমাণ হয়। তোমার আমার চক্ষে, অর্থাৎ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অলীক বা পরিবর্ত্তনশীল হউক, কিন্তু ইহাতে,—এই প্রপঞ্চে, যে নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত সচ্চিদানন্দের সত্তা আছে, তাহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার সত্তা নাই, এমন বস্তু কল্পনা করিতে পারি না। তাঁহার সত্তা যাহাতে আছে, তাহাই সৎ। জগৎ যদি কার্য্য বা বিকাশ বা অভিব্যক্তি হয়, তবে ইহার অন্তরালে বা মূলে কারণ নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে, না

থাকিয়া পারে না। কিছু-না বা শূন্য হইতে কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে না। কার্য্যের পূর্ব্বাবস্থা বা মূলাবস্থা অসৎ হইতে পারে না। যাহা কার্য্যের পূর্ব্বাবস্থা বা মূলাবস্থা, তাহা নিশ্চয়ই সৎ। সদ্বস্তুই কার্য্যের মূল বা কারণ। সৎ হইতে সৎই প্রসূত হয়, অসৎ প্রসূত হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টি বা জগৎ সৎ—অসৎ বা অলীক নয়। ভেদ বুদ্ধিতে ধরিলে জগৎ অসৎ—অভেদ বুদ্ধিতে ধরিলে, জগৎ সৎ।

ভেদবুদ্ধির মূল মায়া। সৎ কি অসৎ, এই অনির্ব্বাচ্য ভাবটী মায়াবিজৃম্ভিত। মাটীর একটী ঘট দেখিতেছি। মৃণ্ময় ঘটটী জাজ্বল্যমান আমার চক্ষুর সম্মুখে বর্ত্তমান। তাহার অস্তিত্বের অপলাপ করিবার উপায় নাই। তাহাকে অসৎ বলিতে পারি না, কারণ বুদ্ধি তাহাকে সৎ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ীভূত হইয়াছে। কিন্তু যুক্তি এবং কার্য্য কারণ তত্ত্বের দুর্ভেদ্য অখণ্ডনীয় নিয়ম অনুসারে ঘটটীকে সৎ বলিয়াও সি[illegible]ন্ত করিতে পারি না। বরং ঘটটী অসৎ বলিয়া প্রতীত[illegible]য়। যাহা প্রথমে সৎ এবং পরে অসৎ বলিয়া চিত্তে ধারণা হয়—অথবা বস্তুতঃ যাহা পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকে না, কেবল মধ্যে ক্ষণকালের নিমিত্ত যাহার ঐন্দ্রজালিক অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়, তাহাই মায়া। "মাটীর ঘট" বলিলেই, কার্য্যকারণ একসঙ্গে বলা হয়। মাটী কারণ,

ঘট কার্য্য। মাটী হইতে ঘট পৃথক নয়—কারণ হইতে কার্য্য পৃথক্ হইতে পারে না। ঘটটী মাটীময়, কার্য্য-কারণময়। নির্ম্মানের পূর্ব্বে, অর্থাৎ বিকাশের পূর্ব্বে, ঘটটী মাটীর মধ্যে—কার্য্যটী কারণের মধ্যে, অব্যক্তভাবে বর্ত্তমান থাকে। আবার বিনষ্ট হইলেও ঘটটী মাটীর মধ্যে, কার্য্যটী কারণের মধ্যে বিলুপ্ত হয়, মিশিয়া যায়। যে বস্তু যখন বিনষ্ট হয়, সে বস্তু তখন স্বীয় কারণেই বিলীন হয়। কারনে বিলীন হওয়া, অথবা কারণাপন্ন হওয়ার নামই বিনাশ। নশ্বর, অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর—যাহা কিছু বল, সমস্তই একার্থ-বাচক—সমস্তই এই কারণাপন্ন হওয়া। ফলতঃ ব্যক্তাবস্থা কার্য্য, অব্যক্তাবস্থা কারণ। অব্যক্তাবস্থা যদি কারণ হইল, তাহা হইলে ব্যক্ত ঘটের যে কারণ, অর্থাৎ মাটী, তাহাকে অব্যক্ত কি প্রকারে বলিতে পারি? এ প্রকার প্রশ্ন মনে উদিত হইতে পারে। কারণ মাটী ত ব্যক্ত, সকলেই উহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং মাটী যদি ব্যক্ত হইল, তবে মাটীর একটী অব্যক্ত কারণ অবশ্যই আছে। এইরূপে ব্যক্ত অব্যক্ত—কার্য্য কারণ পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে যখন মূলে আমরা যাইয়া উপস্থিত হই, তখন যাবতীয় কারণের কারণ এক অব্যক্ত কারণ ব্রহ্ম দেখিতে পাই। সেই অব্যক্ত কারণ ব্রহ্ম হইতেই এই ব্যক্ত পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ সমুদ্ভূত। সুতরাং ব্যক্তাবস্থা কার্য্য, অব্যক্তাবস্থা কারণ—বিকাশ কার্য্য, প্রচ্ছন্নতা কারণ।

এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থার ধর্ম্ম পরস্পর পৃথক ও বিরোধী। যাহা ব্যক্ত অবস্থার সাধর্ম্ম্য, তাহা অব্যক্ত অবস্থার বৈধর্ম্ম্য—যাহা অব্যক্ত অবস্থার সাধর্ম্ম্য, তাহা ব্যক্ত অবস্থার বৈধর্ম্ম্য। ব্যক্ত বস্তু অনিত্য, সক্রিয়, আশ্রিত, সাবয়ব এবং পরাধীন অর্থাৎ কারণের অধীন। যাহা অব্যক্ত তাহা নিত্য, নিষ্ক্রিয় * অনাশ্রিত, নিরবয়ব ও স্বাধীন। এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থার পরস্পর পার্থক্য বা বৈপরীত্য বোধ ভেদ-বুদ্ধিবিজৃম্ভিত। যে পর্য্যন্ত ব্যক্ত ও অবক্ত্য বস্তু পৃথক পৃথক বলিয়া চিত্তে প্রতিভাত হইবে, সেই পর্য্যন্তই ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুর সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু অভেদ বুদ্ধিতে দেখিলে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুতে মূলতঃ পার্থক্য নাই বলিয়া প্রতীত হইবে, কারণ অব্যক্তই ত ব্যক্তের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান থাকে, এবং ব্যক্ত, কালে, অব্যক্ততেই ত বিলীন হয়। তবে এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত, উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যবর্ত্তী ক্ষণকালের নিমিত্ত যে বস্তুটী ঘট বলিয়া চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল, অথচ উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং বিনাশের পরে ঘটটীর ঘটাকারে

* ঘট মৃত্তিকার রূপান্তর। সুতরাং ঘট মৃত্তিকার বিকার। এই বিকার অবস্থাতেও কারণমৃত্তিকা আপনাকে কার্য্য-ঘটের মধ্যে হারাইয়া ফেলে না। স্ব স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই মৃত্তিকা ঘটের আকার ধারণ করে। সুতরাং মৃত্তিকা নিষ্ক্রিয়। কারণ মাত্রেরই স্বরূপ এই প্রকার।

উপলব্ধি হয় না, ঘটটী ইন্দ্রিয়াদির গোচর হয় না, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ীভূত হয় না, তাহাই মায়া। ফলতঃ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই অলীক, তাহাই মায়া, তাহাই বিকারী। অলীক পদার্থের স্থায়িত্ব নাই। উহা বিকারী ও বিনাশী। উহা সৎও নয়, অসৎও নয়। যাহা সৎও নয় অসৎও নয়, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধি যাহার প্রকৃত পরমার্থ স্বরূপ গ্রহণ করিতে অসমর্থা, তাহাই মায়া।

নামরূপধারিণী আমার স্নেহময়ী জননীকে আমি সাক্ষাৎ নিরীক্ষণ করিতেছি। তাঁহার স্নেহ ও সোহাগ, যত্ন ও আদর অনুক্ষণ পাইতেছি। তাঁহার স্তন্য, আমার জীবন; তাঁহার অঙ্ক, আমার শান্তি নিকেতন; তাঁহার হাসি, আমার আশা; তাঁহার বাক্য, আমার বেদ; তাঁহার বাহু, আমার বল; তাঁহার চরণযুগল, আমার চতুর্ব্বর্গফল। সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বের অপলাপ করিবার উপায় নাই। তিনি সৎ, কখনই অসৎ নহেন, ইহাই আমার ধারণা। কিন্তু যুক্তি এবং কার্য্যকারণ তত্ত্বের দুর্ভেদ্য ও অখণ্ডনীয় নিয়ম অনুসারে, প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি গোচরীভূতা, পরমারাধ্যা, আমার স্নেহ-ময়ী জননীকে সৎ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি না, বরং মা আমার অসৎ বলিয়া প্রতীত হন। 'আমার জননী' পাঞ্চ-ভৌতিক দেহী—অথবা পাঞ্চভৌতিক এবং ঐন্দ্রিয়িক দেহী। কারণ জীবের দেহ পঞ্চভূতাত্মক ও ইন্দ্রিয়াত্মক,

জীব স্থূল ও লিঙ্গ দেহী। পাঞ্চভৌতিক দেহী বলিলেই কার্য্য কারণ একসঙ্গে বলা হয়। পঞ্চভূত কারণ, দেহ কার্য্য, পঞ্চভূত হইতে দেহ পৃথক নয়—কারণ হইতে কার্য্য পৃথক হইতে পারে না। নির্ম্মাণের পূর্ব্বে, অর্থাৎ বিকাশের পূর্ব্বে, দেহটী পঞ্চভূতে অব্যক্তভাবে বর্ত্তমান থাকে, আবার বিনষ্ট হইলে দেহ পঞ্চভূতে—কার্য্য কারণে—বিলুপ্ত হয়, মিশিয়া যায়, কারণাপন্ন হয়। এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত, উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যবর্ত্তী ক্ষণকালের নিমিত্ত যে বস্তুটী "আমার জননী" বলিয়া চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল, অথচ উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং বিনাশের পরে "আমার জননী", "আমার জননী" আকারে চিত্তে প্রতিভাত হন না, তাহাই মায়া। আমার ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধি "আমার জননীর" প্রকৃত স্বরূপ গ্রহণ করিতে অসমর্থা, তাই "আমার জননীর" দেহ নাশে, আমার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়,—আমি মাতৃহীন হইয়া হাহাকার করি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি অনির্ব্বাচ্য ভাবই মায়া, অর্থাৎ সৎ কি অসৎ যখন অবধারণ করা যায় না, সেই অনির্ব্বাচ্য ভাবই মায়া। কিন্তু মায়া আসিল কোথা হইতে? মায়ার সত্তা, অস্তিত্ব, কোথায়? মায়ার আশ্রয়, অবলম্বন কি? কাহার শক্তিতে মায়া শক্তিশালিনী? মায়া বিকারী, সুতরাং পরিণামিনী। কিন্তু মায়া কাহার বিকার? বিকারের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা, পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। যাহার বিকার, তাহার সত্তাই বিকারেরও সত্তা। যাহা বিকারের

আশ্রয় ও অবলম্বন, তাহাই বিকারের সত্তা। ব্রহ্মসত্তাই যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের—পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের, একমাত্র সত্তা। মায়াও ব্রহ্মসত্তারই একটা বিশেষ অবস্থা, একটা বিকাশ, একটা বিকার মাত্র। যে যাহার বিকাশ বা বিকার, সে তাহা হইতে অভিন্ন, অপৃথক—তাহার পৃথক সত্তা থাকিতে পারে না। ঘট মাটীর বিকার, একটা অবস্থান্তর, একটা রূপান্তর মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া কি ঘট মাটী হইতে পৃথক? মাটীই ঘটের সত্তা। মাটী ছাড়া মাটীর ঘট কখনও কল্পনা করিতে পার কি? সুতরাং যে যাহার বিকার, সে তাহা হইতে অভিন্ন, অপৃথক্। সুতরাং মায়া ব্রহ্মসত্তার একটা বিকার হইলেও, ব্রহ্মসত্তা হইতে মায়া পৃথক্ নয়—মায়া পরিণামিনী হইলেও, অপরিণামী ব্রহ্ম হইতে অপৃথক। পরিণাম ত একটা কার্য্য। কার্য্য কারণ হইতে অপৃথক্, কার্য্য কালে কারণাপন্ন হয়, কার্য্যে কারণ অনুস্যূত থাকে। অতএব ব্রহ্ম সত্তাই মায়ার সত্তা, ব্রহ্ম সত্তাই মায়াতে অনুস্যূত, ব্রহ্ম সত্তাতেই মায়া শক্তিশালিনী, ব্রহ্মই মায়া শক্তির অধিষ্ঠান, উপাদান, অবলম্বন, আশ্রয়। ব্রহ্মসত্তা হইতে মায়ার স্বতন্ত্রসত্তা নাই। কিন্তু ব্রহ্ম মায়া হইতে স্বতন্ত্র। দর্পণে আমার মুখ দেখিতেছি। দর্পণস্থ মুখের পৃথক কোন সত্তা নাই। আমার মুখের সত্তাই দর্পণস্থ মুখের প্রতিবিম্বের কারণ। দর্পণস্থ মুখের পৃথক্ সত্তা না থাকিলেও, আমার

মুখের একটা স্বতন্ত্র, একটা পৃথক সত্তা আছেই। দর্পণের অভাব হইলে, সেই সঙ্গে আমার মুখের অভাব হয় না, আমার মুখ থাকেই,—যেখানে আছে, সেইখানেই থাকে। সুতরাং দর্পণস্থ মুখ ও আমার মুখ এক হইলেও এইরূপে স্বতন্ত্র, কারণ দর্পণে মুখের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সে প্রতিবিম্ব নানাকারণে কিঞ্চিৎ বিকৃত, সুতরাং পরিণামী। কিন্তু বিম্ব বা মুখ অপরিণামী, সুতরাং স্বতন্ত্র। তদ্রূপ মায়া ব্রহ্মসত্তা হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু ব্রহ্মসত্তা মায়া হইতে স্বতন্ত্র। মায়ার অভাব হইলে, সেই সঙ্গে ব্রহ্মসত্তার অভাব হয় না, ব্রহ্মসত্তা থাকেই। ইহাই ব্রহ্মসত্তার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব। মায়া বা প্রপঞ্চ ব্রহ্মানুগত, সসীম, বিকারী। কিন্তু ব্রহ্ম মায়া বা প্রপঞ্চের মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়াও অসীম, অবিকারী, স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম অবিকারী বলিয়াই স্বতন্ত্র। যাহা বিকারী তাহা তাঁহারই মধ্যে। কিন্তু তিনি বিকারীর মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়াও অবিকারী, সুতরাং স্বতন্ত্র। তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য, ভেদসূচক নয়, তাঁহার অসীমত্বসূচক। বস্তুতঃ ব্রহ্মে ও সৃষ্টিতে ভেদ বা স্বাতন্ত্র্য নাই, কারণ সৃষ্টি ব্রহ্মানুগতা, ব্রহ্ম ছাড়া নয়। ব্রহ্মসত্তাই সৃষ্টির সত্তা, কিন্তু ব্রহ্ম সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়াও—তিনি সৃষ্টির প্রাণশক্তি হইয়াও, সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র। প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে, প্রত্যেক বিকারের মধ্যে, প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে ব্রহ্মসত্তা

অনুস্যূত, অনুপ্রবিষ্ট, অন্তর্নিহিত—অথচ তিনি স্বতন্ত্র। নিখিল সংসারের একমাত্র উপাদান, অবলম্বন, কারণ—ব্রহ্ম, অথচ তিনি স্বতন্ত্র। যাবতীয় পদার্থের সহিত ব্রহ্ম ওত প্রোতভাবে জড়িত, লিপ্ত থাকিয়াও তিনি নির্লিপ্ত, স্বতন্ত্র। আমরা তাহা ভুলিয়া যাই, তাহা দেখিতে পাই না—বুঝিতে পারি না। অধিকন্তু আমরা পদার্থ, বিকার ও কার্য্যগুলিকে এক একটা স্বতন্ত্র, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। আমরা ভাবি ব্রহ্মের সহিত উহাদের কোন সম্বন্ধ নাই—উহারা নিজেরাই এক একটা স্বয়ম্ভূ। ইহাই ভেদবুদ্ধি, ইহাই অজ্ঞান, ইহাই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, ইহাই যাবতীয় দুঃখের মূল, অশান্তির নিদান।

যিনি ত্রিগুণাতীত অথচ ত্রিগুণময়, যিনি সৃষ্টির অতীত অথচ সৃষ্টি যাঁহাতে—মায়ামুগ্ধ, ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না; দেখিতে পায় না, বুঝিতে পারে না যে, আদ্যন্ত যাহা সৎ, মধ্যেও তাহা সৎ—সৎ ভিন্ন অসৎ হইতে পারে না। যাবৎ স্বর্ণহারে হারের প্রতি দৃষ্টি থাকিবে, তাবৎ স্বর্ণ দৃষ্টি ঘটিতে পারে না। যাবৎ মৃন্ময় ঘটে ঘটের প্রতি দৃষ্টি থাকিবে, তাবৎ মৃন্ময় দৃষ্টি ঘটিতে পারে না। তদ্রূপ ত্রিগুণময়ী দৃষ্টি থাকিতে আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন ঘটিতে পারে না। একান্ত ভক্তিসহকারে তাঁহারই শরণাপন্ন হইলে, তাঁহার কৃপায়, তাঁহার এই দুস্তর মায়া অতিক্রম করা যাইতে পারে, অজ্ঞান নাশ হইতে পারে,

ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া অভেদ বুদ্ধির উদয় হইতে পারে, ইহা তাঁহারই উক্তি—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীতা ৭।১৪)

এই গুরুগম্ভীর ভগবদ্বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট পথানুগামী হইয়া, যাঁহারা মায়াজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এস্থলে সেই অসম্ভবসম্ভবসমর্থনশালী, অঘটনঘটনপটু মহাপুরুষগণের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিব না। ত্যাগীর কথা উল্লেখ না করিয়া, গৃহীর কথা যথাসাধ্য আলোচনা করিব। গৃহীর পক্ষে মায়া পরিহার করা সম্ভব কিনা, তাহাই যথাশক্তি বিবেচনা করিব। পুত্র, কলত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, সম্পত্তি ইত্যাদি মায়ার উপকরণ। এইগুলি লইয়াই গার্হস্থ্য। ইহার প্রত্যেকটী গৃহীর পক্ষে অপরিত্যাজ্য। যে বস্তু দ্বারা যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইলে, সেই বস্তুরই প্রয়োজন, নতুবা কার্য্যোদ্ধার হয় না। সংসার করিতে হইলে, ইহার কোনটীকেই ত্যাগ করিলে চলিবে না। ত্যাগে কার্য্যোদ্ধার হয় না। বস্তুত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ নয়। বস্তুর প্রতি মায়া ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। ইচ্ছাপূর্ব্বক, অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা দ্রব্যের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, যিনি দ্রব্য ত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগেও নিশ্চিন্ত থাকা সুকঠিন। বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিলে,

ত্যক্ত বস্তু পুনর্গ্রহণের আশঙ্কা থাকে। নিদ্রিত ব্যক্তির কর-স্থিত পুস্তক যেমন স্বতএব করচ্যুত হয়, বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য, অভেদবুদ্ধিসম্পন্ন, ভগবচ্চিন্তানিমগ্নচেতা গৃহীর হৃদয় হইতে সংসার-মায়া যখন সেইরূপ আপনা হইতেই স্খলিত হয়, প্রকৃত ত্যাগ তাহাকেই বলিতে পারি। এরূপ ত্যাগ গৃহীর পক্ষেও সম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। ভগচ্চরণপ্রান্তে অক-পটভাবে দেহ মন সমর্পণ করিয়া, স্ত্রীপুত্র গৃহক্ষেত্রাদি লইয়া সংসার-যাত্রা সুনির্ব্বাহ হইতে পারে। জলাশয় হইতে আনীত পূর্ণকুম্ভ মস্তকে স্থাপন করিয়া রমণী যেমন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, পথিমধ্যে কথোপকথন করে,—অথচ মস্তক-স্থিত পূর্ণকুম্ভের প্রতি তাহার দৃষ্টি ও মন স্থির, পূর্ণকুম্ভটীও রমণীর মস্তকের উপর স্থির ও অবিচলিত থাকে, তদ্রূপ ভগবন্নারায়ণকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া—তাঁহাকে সেখানে স্থাপন করিতে হইবে না, তিনি সেখানে নিত্য বিরাজমান,*—তাঁহার প্রতি দৃষ্টি ও মন স্থির ও অচল রাখিয়া, গৃহীও সংসার-যাত্রা সুনির্ব্বাহ করিতে পারে। ক্রমে চিন্তার সাহায্যে, বৈরাগ্যের প্রাবল্যে, ভক্তির প্রভাবে, জ্ঞানের গৌরবে, অভেদ বুদ্ধির মাহাত্ম্যে যতই ঈশ্বরসমীপবর্ত্তী হইবে, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি, অর্থাৎ মায়া, ততই দূরবর্ত্তিনী

---

* অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
(কঠোপনিষৎ)

হীন, বুদ্ধিহীন, স্ফূর্ত্তিহীন। আমি ক্রিয়াহীন, ভক্তিহীন, জ্ঞানহীন। আমার এখন কণ্ঠাগত প্রাণ, লীলা অবসান, হত আশা জ্ঞান। ঐ দেখ, প্রভো, যমদূতের কি বিকট, বিভীষণ করাল বদন, আমায় গ্রাস করিতে আসিতেছে। ঐ দেখ, নাথ, যমরাজের কি ভয়ানক তেজঃসম্পন্ন, প্রাণশোষণ দণ্ড-বিক্ষেপ, আমায় আঘাত করিতে আসিতেছে। নরকের ঐ যে, নাথ, ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, ঐ যে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর প্রহারজনিত কাতর আর্ত্তনাদ, ঐ যে কদর্য্য পূতিগন্ধময় দুর্গম স্থানের সুবৃহৎ দ্বার উন্মুক্ত—আমার চিত্তে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। আমায় এখন রক্ষা কর, ত্রাণ কর, উদ্ধার কর। এই ভাবিতে ভাবিতে মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যু হয়—ভগবান সন্নিধানে তাহার কাতর খেদের ফলাফল কি হয়, ভগবানই জানেন।

কি শিখিলাম ?

কি শিখিলাম ? অশীতিলক্ষযোনি ভ্রমণান্তে সুদুর্লভ মানবদেহ ধারণ করিলাম ; পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্যপুঞ্জ প্রভাবে এবং জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি নিবন্ধন ইহজন্মে তীর্থোত্তম ৺কাশীধামে সুদুর্লভ সৎসঙ্গ লাভ করিলাম ; কিন্তু কি শিখিলাম ?

সংসার তরঙ্গের দুষ্পরিহার্য্য ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইলাম, কুহকিনী আশামরীচিকা কর্তৃক প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হইয়া নৈরাশ্যের সুগভীর অন্ধতমপঙ্কিলে নিমজ্জিত হইলাম ; কিন্তু কি শিখিলাম ?

কার্য্যকারণ, যোগ বিয়োগ, সৃষ্টিনাশ দেখিলাম ; জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, হাসি ক্রন্দন, দেখিলাম ; দেবদানব, স্বর্গ নরক, পাপপুণ্য, দেখিলাম ; সত্যমিথ্যা, বিদ্যাঅবিদ্যা, শান্তি অশান্তি, দেখিলাম ; প্রাক্তন পুরুষকার, ধর্ম্মকর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ দেখিলাম ; কিন্তু কি শিখিলাম ?

দর্শনেই শিক্ষা, শিক্ষাতেই দর্শন। মনঃপ্রেরিত ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বস্তুর ভাবনিচয় গ্রহণ করিয়া মনকে অর্পণ করে। দীর্ঘক্ষণ ধারণ অপটু চঞ্চল মন, ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক আনীত ঐ ভাবগুলি বুদ্ধিকে প্রদান করে। বুদ্ধি ত্রিবিধা—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥

(গীতা—১৮।৩০, ৩১, ৩২)

হে পার্থ, যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয় অভয়, বন্ধন ও মোক্ষ জানা যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কার্য্য অকার্য্য যথাবৎ বুঝিতে পারা যায় না, তাহাই রাজসী বুদ্ধি। যে বুদ্ধি তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং অন্যান্য তাবৎ জ্ঞেয় পদার্থকেই বিপরীত ভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মায়, সেই বুদ্ধিই তামসী বুদ্ধি।

অথবা বুদ্ধি সংস্কারজা। সংস্কার প্রাগুক্ত ত্রিবিধগুণ-মূলক। সুতরাং বুদ্ধি নিজগুণানুরূপ পদার্থ গ্রহণ করিয়া, অপরগুলি ত্যাগ করে। ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে এবং বুদ্ধির সামর্থ্যে যাহা দেখিলাম বা শুনিলাম, অথবা যাহা শিখিলাম, তদনুযায়ী ক্রিয়াশীল হওয়াই প্রকৃত শিক্ষা। কেবল জ্ঞান লাভ শিক্ষা নয়—লব্ধজ্ঞানানুযায়ী আচরণ, প্রকৃত শিক্ষা। এইরূপ শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা জানিয়া, কি শিখিলাম ?

জন্ম ও মৃত্যু এই সংসারের অখণ্ডনীয়, অপরিহার্য্য নিয়ম। জন্মিলে মৃত্যু, মৃত্যু হইলে পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

(গীতা ২—২৭)

কিন্তু জন্ম ও মৃত্যু কি ? জন্ম ও মৃত্যু সুখ ও দুঃখের

হেতু, জীবের ইহাই প্রতীতি। এই প্রতীতি কতদূর সমীচীন ও সঙ্গত, আলোচনা করা আবশ্যক।

জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। জীবের দুইটী দেহ—সূক্ষ্ম ও স্থূল। সূক্ষ্মদেহ কেবল ইন্দ্রিয়াত্মক, স্থূলদেহ ইন্দ্রিয় শক্তিযুক্ত পঞ্চভূতাত্মক। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, চিত্ত—এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্মদেহের উপাদান। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম—এই পাঁচটী স্থূল দেহের উপাদান।* এই সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহে পরমাত্মার বা চৈতন্যের অধিষ্ঠান হইলে, ক্রিয়াশক্তির আবির্ভাব হয়। কেবল জড়ের অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহের ক্রিয়াশক্তি নাই। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত জড় ক্রিয়া করিতে পারে না। জড়ের মূলে চেতন না থাকিলে, জড় শক্তিহীন। চেতন থাকিলে জড় শক্তিমান, ক্রিয়াশীল। শক্তিমানের শক্তিতেই জড় শক্তিযুক্ত। ফলতঃ চৈতন্য দ্বারা চালিত হইয়াই জড় ক্রিয়া করে। জীবের দেহে এই ক্রিয়াশক্তির আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি—অর্থাৎ দেহের সহিত জীবের বা চৈতন্যের এই সংযোগ, জীবের জন্ম। যাবৎ চৈতন্য অধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহে ক্রিয়াশক্তি বিদ্যমান, তাবৎ জীবন; ক্রিয়াশক্তির

* এই ইন্দ্রিয়শক্তির আধার স্বরূপ পঞ্চভূতের উপাদানও সঙ্গে সঙ্গে থাকে বুঝিতে হইবে। কেবল তাহার স্থূল বিকাশ হয় নাই, এই মাত্র।

লয়—অর্থাৎ দেহের সহিত জীবের বা চৈতন্যের বিয়োগ, জীবের মৃত্যু। যে শক্তি জীবের হৃদয়ে "আমিত্ব" অভিমান উৎপাদন করে—ভেদবুদ্ধি জন্মায়—সেই শক্তির আবির্ভাবে জীবের জন্ম। এই "আমিত্ব" উৎপাদিকাশক্তির নাশ, জীবের মৃত্যু। ফলতঃ উপলব্ধিই জন্ম, অনুপলব্ধি মৃত্যু। বিপ্রকুমার উপনীত হইলে, তাহার দ্বিজত্ব অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম, তাহার উপলব্ধি হয়। "আমি দ্বিজ" এই উপলব্ধি যেমন তাহার দ্বিতীয় জন্ম, তদ্রূপ "আমি শরীরী" এই উপলব্ধি জীবের জন্ম। উপলব্ধি জন্ম এবং অনুপলব্ধি মৃত্যু হইলে, জগৎ অনিত্য হইয়া পড়ে, কারণ উপলব্ধি অনিত্য। দর্শন, রসন, ঘ্রাণ, স্পর্শন, শ্রবণ, এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচটী বিষয়ের যে সম্বন্ধ, অথবা সম্বন্ধজনিত যে উপলব্ধি, তাহা অনিত্য। সুতরাং উপলব্ধি অনিত্য হইলে, জগতও অনিত্য। কিন্তু জগৎ অনিত্য নয়। যে শক্তি হইতে জগৎ সমুদ্ভূত—জগৎ যে শক্তির বিকাশ, সেই শক্তি নিত্য। নিত্য হইতে অনিত্যের উৎপত্তি হইতে পারে না।* যে যে স্বরূপ-

---

* সদ্ব্রহ্ম কার্য্যং সকলং সদেব তন্মাত্রমেতন্ন ততোঽন্যদস্তি।
অস্তীতি যো বক্তি ন তস্য মোহো বিনির্গতো নিদ্রিতবৎ প্রজল্পঃ॥

ব্রহ্ম সৎ, সুতরাং তাঁহার যাবতীয় কার্য্যই সৎ। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থের অস্তিত্বই নাই। ইহা যিনি স্বীকার না করেন, তিনি ভ্রান্ত, নিদ্রিত অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তির উক্তির ন্যায় তাঁহার বাক্য অসার।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের কেবলোঽহম্ ৮।

বিশিষ্ট, তৎসৃষ্ট পদার্থ সেই স্বরূপবিশিষ্টই হইবে, অতিরিক্ত বা তদ্ভিন্ন হইতে পারে না। কারণ হইতে কার্য্য, বিম্ব হইতে প্রতিবিম্ব, পৃথক হইতে পারে না। ব্রহ্মসত্তা বিশ্বের বীজ, ব্রহ্মসত্তা বিশ্বের সত্তা, ব্রহ্মসত্তা বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত, অনুপ্রবিষ্ট, অন্তর্নিহিত। সুতরাং জগৎ যখন ব্রহ্মচৈতন্যসম্ভূত, জগৎ যখন ব্রহ্মশক্তিরই বিকাশ, পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব—ব্রহ্মসত্তা জগতে যখন ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত, তখন জগৎ নিত্য—অনিত্য হইতে পারে না। বিষয় এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে উপলব্ধি অনিত্য, কিন্তু বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের মূলে যে শক্তি বর্ত্তমান, তাহা নিত্য। এই নিত্য বস্তু দ্বারা সম্বন্ধযোগে পরস্পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বশতঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ের যে উপলব্ধি তাহা অনিত্য। উপলব্ধি অনিত্য, কিন্তু উপলব্ধিমূলক পদার্থের সত্তা নিত্য। উপলব্ধিমূলক পদার্থের সত্তা উপলব্ধির পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকে, মধ্যকালেও থাকে। জলবুদ্‌বুদ্, বুদ্‌বুদ্ আকারের পূর্ব্বেও জল ছিল, পরেও জলই হয়—জলে মিশিয়া যায়,—এতদুভয়ের মধ্যাবস্থা অর্থাৎ বুদ্‌বুদ্ আকারেও জলই থাকে, কারণ বুদ্‌বুদ্ ত জলেরই বুদ্‌বুদ্, সুতরাং জলের বুদ্‌বুদ্ জল ছাড়া হইতে পারে না। তবে বুদ্‌বুদ্ জলের বিকার। এই বিকার, বিনাশী, অনিত্য। সুতরাং দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্‌বুদ্‌রূপ বিষয়ের অর্থাৎ জলের বিকারের যে সম্বন্ধ বা উপলব্ধি তাহা অনিত্য।

সুবর্ণ বলয়, বলয় আকারের পূর্ব্বেও সুবর্ণ ছিল, তদাকার নাশেও সুবর্ণই থাকে, অর্থাৎ সুবর্ণে মিশিয়া যায়। এতদুভয়ের মধ্যাবস্থা অর্থাৎ বলয়াকারেও সুবর্ণই থাকে, কারণ সুবর্ণবলয় সুবর্ণ ছাড়া হইতে পারে না। কিন্তু বলয় সুবর্ণের বিকার। বিকার অনিত্য, নাশশীল। সুতরাং দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত বলয়রূপ বিষয়ের অর্থাৎ সুবর্ণের বিকারের যে সম্বন্ধ বা উপলব্ধি তাহা অনিত্য।

আত্মজে, আত্মজ আকারের পূর্ব্বেও আত্মা ছিল, পরেও আত্মাই থাকে, অর্থাৎ আত্মায় মিশিয়া যায়। এতদুভয়ের মধ্য অর্থাৎ আত্মজ অবস্থাতেও আত্মজে আত্মাই থাকে, কারণ আত্মা হইতেই আত্মজের জন্ম, উৎপত্তি। উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, এই তিন অবস্থাতেই আত্মজে আত্মসত্তা বর্ত্তমান। আত্মা হইতে আত্মজের পৃথক অস্তিত্ব নাই এবং কোন কালে, কোন অবস্থাতেই—স্বরূপে বা বিকারে—পৃথক অস্তিত্ব ঘটিতে পারে না। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা আত্মার বিকার। বিকার বিনাশী, অনিত্য। সুতরাং দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত আত্মজ বিষয়ের বা আত্মার বিকারের যে সম্বন্ধ বা উপলব্ধি তাহা অনিত্য। কিন্তু আত্মার ত বিকার ঘটে না, আত্মা যে অবিকারী। অবিকারীকে বিকারী দেখি ব্যবহারিক দৃষ্টি দ্বারা। পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিলে আত্মজ আত্মা ছাড়া

নয়। যাহা আত্মা ছাড়া নয়, আত্মা যাহাতে অনুস্যূত, অনুপ্রবিষ্ট—আত্মসত্তা যাহাতে অন্তর্নিহিত, তাহা নিত্য—অনিত্য হইতে পারে না! সুতরাং উপলব্ধি অনিত্য, উপলব্ধিমূলক পদার্থের সত্তা নিত্য। ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—আদি, মধ্য, অন্ত—ত্রিকালেই পদার্থের সত্তা নিত্য। পরমাত্মার বিকাশ বলিয়া—পদার্থ মাত্রেই পরমাত্মা অনুস্যূত রহিয়াছেন বলিয়া, পদার্থ নিত্য।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥

(গীতা—১০।২০)

হে গুড়াকেশ, আমি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তঃকরণস্থিত আত্মা, আমি জীবের অন্তরাত্মা, আমি প্রাণিগণের আদি, মধ্য ও অন্ত—আমিই তাহাদের জন্ম, স্থিতি ও বিনাশের হেতু।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥

(গীতা—১০।৩৯)

হে অর্জ্জুন, সর্ব্বভূতের যাহা বীজ, তাহাও আমি, যেহেতু স্থাবর জঙ্গমে এমন কোন ভূত পদার্থ নাই যাহা আমি ব্যতিরেকে হইতে পারে।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

(গীতা—১০।৪২)

অথবা হে অর্জ্জুন, পৃথক্ পৃথক্ বিভূতি দর্শনে তোমার কি প্রয়োজন? তুমি সর্ব্বত্র সমদর্শন কর—"সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এইরূপ ধারণা কর, যেহেতু আমি ভিন্ন জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

অতএব বুঝিলাম, ইন্দ্রিয়শক্তি অধিষ্ঠিত সূক্ষ্মদেহ এবং পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ জীবেরই নামান্তর মাত্র—জীবাত্মারই বিকাশ, অভিব্যক্তি, আত্মা হইতে অপৃথক, সুতরাং নিত্য, অবিনাশী।

স্থূলদেহ জীর্ণ অথবা বাসের অনুপযুক্ত হইলে, সূক্ষ্মদেহ উহাকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় স্থূলদেহান্তর গ্রহণ করে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

(গীতা ২।২২)

ত্যক্ত স্থূলদেহ অর্থাৎ "মৃতদেহ" পঞ্চভূতে লীন হয়। পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কারতত্ত্ব মহৎতত্ত্বে, মহৎতত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হয়। চিচ্ছক্তিঅধিষ্ঠিতা প্রকৃতি হইতে প্রাগুক্ততত্ত্বনিচয় সমুদ্ভূত। যাঁহা হইতে উৎপন্ন, দেহ, কালে তাঁহাতেই বিলীন হয়, কারণাপন্ন হয়। অতএব জন্ম ও মৃত্যু, যে দিক দিয়াই দেখি, কার্য্যকারণাভেদনিবন্ধন জীব বা জগতের নিত্যতাই প্রতিপন্ন হয়, অনিত্যতা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত বলিয়া প্রতীত হয়।

অনিত্য বুদ্ধির মূলে ভেদজ্ঞান বিদ্যমান। ব্রহ্মসত্তা

হইতে পৃথক বোধে বিষয়ের উপলব্ধি, ভেদবুদ্ধি। ভেদবুদ্ধি দূর হইলেই নিত্য বা অভেদ জ্ঞানের উদয় হয়। ভেদবুদ্ধি সমস্ত দুঃখের মূল। ভেদবুদ্ধি আছে বলিয়াই আমরা নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। যখন দুঃখ ভোগ করি, ভেদবুদ্ধি তখন অবশ্যই আছে, না থাকিয়া পারে না, কারণ ভেদবুদ্ধির ধর্ম্মই দুঃখের সৃষ্টি করা। "আমি দুঃখ অনুভব করিতেছি" বলিলেই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ইহার মধ্যে আসিয়া পড়ে—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা। দুঃখের অনুভব, জ্ঞান ; দুঃখ, জ্ঞেয় ; আমি, জ্ঞাতা। এই জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ত্রিবিধ বস্তু দুঃখ ভোগের পূর্ব্বে, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি থাকাকালে, বিদ্যমান থাকে। কিন্তু দুঃখের নিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তি, জীবের ইহাই আকাঙ্ক্ষা, ইহাই জীবের চরম লক্ষ্য। এই দুইটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জীব নিয়ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, অহরহঃ কর্ম্ম করিতেছে, বারবার যাতায়াত করিতেছে। দুঃখের অবসান এবং সুখ প্রাপ্তি ঘটিলেই তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, কর্ম্মের শেষ হয়, যাতায়াত রহিত হয়। এই আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধির উপায় কি ? কি করিলে দুঃখের নিবৃত্তি এবং সুখ প্রাপ্তি ঘটিতে পারে ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভেদবুদ্ধি সমস্ত দুঃখের মূল। এই ভেদবুদ্ধি দূর করিয়া, অভেদবুদ্ধিতে, অদ্বৈত জ্ঞানে, জগদ্দর্শন করিলে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান—ধ্যাতা, ধ্যেয়, ধ্যান—এক বলিয়া প্রতীত হইবে। এই একাকার দর্শন বা অভেদদর্শনই ব্রহ্মদর্শন, আত্মদর্শন। এই আত্ম-

দর্শন লাভ হইলে—জীব এই চরম অবস্থায় আসিলে, তাহার বাসনা ও কর্ম্মের লোপ হয়, দুঃখের নিবৃত্তি হয়, বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ ঘটে—কারণ তখন ব্রহ্মভাব, সর্ব্বাত্মজ্ঞান তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অদ্বৈত জ্ঞানেই মুক্তি—এই অদ্বৈত জ্ঞানই মৃত্যুর মৃত্যু। সুতরাং জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখের হেতু, ইহা অজ্ঞানীর জ্ঞান, জ্ঞানীর নিকট অজ্ঞান।

পদার্থ মাত্রই পরমাত্মার বিকাশ বা প্রতিবিম্ব। এই জ্ঞানই সুখের একমাত্র হেতু,এবং এই জ্ঞানের অভাবই দুঃখের একমাত্র কারণ। পরমাত্মা নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিত্য, সত্য। তিনি অক্ষয়, অব্যয়, পরমব্রহ্ম। সাংখ্য মতে—তিনি ব্যক্ত, অব্যক্ত, পুরুষ ও কাল। তিনি নিরাকার, তিনি সাকার। তিনি নিরবয়ব, তিনি সাবয়ব। তিনি উপাধিবিবর্জ্জিত, তিনি উপাধিবিশিষ্ট। ব্যক্ত, অব্যক্ত, পুরুষ ও কাল তাঁহার এই প্রধান রূপ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, উদ্ভব ও প্রকাশের হেতু। কার্য্যকারণশক্তিযুক্ত সদেকরূপ ভগবান উৎপত্তি ও লয়ের নিদান। প্রলয়কালে কেবল প্রধান, ব্রহ্ম ও পুরুষ ছিলেন। এই প্রধান ও পুরুষরূপদ্বয় নিরুপাধি বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে পৃথক হইয়াও অপৃথক। তাঁহার [illegible]র রূপ কাল। সৃষ্টিকালে কাল, প্রধান ও পুরুষরূপদ্বয়কে সংযোগ ও প্রলয়কালে বিয়োগ করেন। মহাপ্রলয়কালে বিশ্ব প্রকৃতিতে লীন থাকে। সে সময়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ত্রয়ের সাম্যভাব। সে সময়ে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক

থাকেন। পরে, সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, পরমব্রহ্ম পরমাত্মা, পুরুষ ও প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে সচেতন করেন। তাঁহারা চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট হইয়া অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও স্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন,—অর্থাৎ যাঁহারা পরমাত্মাতে লীন ছিলেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রকাশ করেন। চৈতন্যময় পুরুষ অধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে ক্রমে মহততত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হয়। সুতরাং সৃষ্টি প্রকরণেই দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্য অথবা পরমাত্মা প্রত্যেক পদার্থেই অনুস্যূত, অনু-প্রবিষ্ট—অর্থাৎ পদার্থ মাত্রই চৈতন্যাধিষ্ঠিত। স্থাবর জঙ্গ-মাত্মক এই জগতে সমস্ত পদার্থেই চৈতন্য অধিষ্ঠিত। তত্ত্ব-দর্শীর চক্ষে অচেতন পদার্থ নাই। সুতরাং পরমাত্মার স্বরূপ বা বিকাশ বলিয়া পদার্থ মাত্রই—অথবা আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জগৎ চরাচর নিত্য ও সচেতন, সৎ ও সনাতন।

জগৎ যদি পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া নিত্য হইল, তবে ইহাকে বিষাদময় দেখি কেন ? জগৎ যখন আনন্দস্বরূপেরই বিকাশ, তখন ইহাতে এত দুঃখ আসিল কিরূপে ? চতুর্দ্দিক হতাশের আক্ষেপ, শোকের উচ্ছ্বাস, কাতর-বিলাপ সতত শুনিতে পাই কেন ? এ প্রশ্নের এক মাত্র উত্তর মায়া। প্রকৃত প্রস্তাবে কেহই মরে না—মৃত্যু কাহারই নাই। আত্মার জন্মমরণশূন্যত্ব হেতু, সকলেই জন্মমরণশূন্য। দেহীর স্থূল দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা এই তিনটী অবস্থা ঘটিয়া

থাকে। এই অবস্থাত্রয়ের পরিবর্ত্তন হয়। কৌমার অপগমে যৌবনোৎপত্তি, এবং যৌবন অপগমে জরার উৎপত্তি হয়। কৌমারের দেহ যৌবনে থাকে না, যৌবনের দেহ জরায় থাকে না। কিন্তু "আমিত্ব" অভিমান বিদ্যমান থাকে। স্থূলদেহের অবস্থাত্রয়ের পরিবর্ত্তনে আত্মার যেমন কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, তদ্রূপ দেহান্তর প্রাপ্তিতেও আত্মার প্রকৃতপক্ষে কোন বৈলক্ষণ্য হয় না।

> দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
> তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥
>
> (গীতা—২।১৩)

তবে যে বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয়—প্রিয়জনের অভাবে অর্থাৎ মৃত্যুতে শোকবিহ্বল হইতে হয়, ইহা কেবল মায়া বা অজ্ঞানের কাজ। আত্মাতে অনাত্মা, অনাত্মাতে আত্মবোধ; বস্তুতে অবস্তু, অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান; স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষকে স্বপ্নপ্রতীতি; রজ্জুতে সর্পভীতি, শুক্তিতে রজতধারণা—ইহাই মায়া। মায়া সম্বন্ধে "মায়া" প্রবন্ধে যথাসাধ্য কিছু বলিয়াছি, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে স্থূলতঃ এই মাত্র এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, মায়া পরিহার করা অসম্ভব নয়। সদসৎ বিচারপটু মানবের বুদ্ধিকে মায়া বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, সত্য। ধূমাবৃত বহ্নিবৎ, জরায়ুসমাচ্ছাদিত গর্ভবৎ, বুদ্ধি মায়াকর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন, সত্য। অজ্ঞান কর্ত্তৃক জ্ঞান আবরিত, স্বীকার

করি। স্বীকার করিয়াও জিজ্ঞাসা করিতেছি—যথার্থই কি মায়ার এতদূর শক্তি ? মেঘ কি প্রকৃতই ভাস্করকে আচ্ছন্ন করিতে পারে ? হইতে পারে মেঘাচ্ছন্ন দিবসে বিভাবসু আমার---অথবা আমার ন্যায় আরও সহস্র সহস্র ব্যক্তির, দৃষ্টিগোচর হন না। কিন্তু তাই বলিয়া কি সূর্য্যদেব মেঘাবৃত ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যাকার্য্যের সাক্ষী কি মেঘাবৃত ? যে মেঘ কর্ত্তৃক সূর্য্যদেব আবৃত, জিজ্ঞাসা করি সেই মেঘ কাহার দ্বারা প্রকাশিত ? প্রকাশশীল বস্তুকে যে বস্তু আবরণ করে, সেই আবরক বস্তু আবার প্রকাশশীল বস্তু দ্বারাই প্রকাশিত হয়। প্রকাশশীল বস্তুর ধর্ম্মই প্রকাশ করা। প্রকাশশীল বস্তু স্বপ্রকাশ—আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, লুক্কায়িত বা আবরিত পদার্থকে এবং আবরককেও প্রকাশ করে। অতএব মেঘের পক্ষে প্রকাশশীল, জ্যোতির্ম্ময়, সূর্য্যদেবকে আবরণ করা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ অজ্ঞান কর্ত্তৃক জ্ঞানের সমাচ্ছন্নতা, মায়া কর্ত্তৃক জ্ঞানের সমাচ্ছন্নতাও অসম্ভব। তবে যে সমাচ্ছন্ন বোধ হয়, ইহা নিজের দৃষ্টিহীনতা, ইহা মায়া বা অজ্ঞান। মায়া জীবের হৃদয়ে অহং, মম, বাসনা, দ্বেষ ও ক্রোধ উৎপাদন করে। জীবের "আমি" বোধ জন্মিলে, "আমার" বোধ তৎক্ষণাৎ জন্মে। "আমার" বোধ বাসনার পূর্ব্বসূচনা, বাসনা দ্বেষের কারণ, দ্বেষ ক্রোধের হেতু। সুতরাং এই সমস্ত কার্য্যকারণ একত্র হইয়া জীবকে অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন এবং কর্ম্মবন্ধনানুবদ্ধ করে।

কর্ম্ম দুই প্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। বিষয়কে ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিয়া তাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত যে বাসনা তাহা কাম, এবং তাহার জন্য যে অনুষ্ঠান, তাহাই কর্ম্ম। ইহাই সকাম কর্ম্ম। বিষয়ের মধ্যে ব্রহ্মসত্তাই অনুস্যূত—বিষয় ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নয়, এইজ্ঞানে ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিমিত্ত যে কামনা ও অনুষ্ঠান, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। ফলতঃ বিষয় কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত যে অনুষ্ঠান, তাহা সকাম কর্ম্ম, এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত যে অনুষ্ঠান, তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম। কর্ম্মে ব্রহ্মদর্শন করিলে, তাহাকে সকাম কর্ম্ম বলা যায় না, তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম হইয়া পড়ে। সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম, কর্ম্মের উদ্দেশ্যের প্রতি নির্ভর করে। পার্থিব সমৃদ্ধি বা স্বর্গাদিসুখলাভ কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইলে, উহা সকাম কর্ম্ম। ব্রহ্মপ্রাপ্তি কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইলে, উহা নিষ্কাম কর্ম্ম। সকাম কর্ম্মে যাতায়াত, জন্ম মৃত্যুর শেষ থাকে না, কারণ কর্ম্মের মূল, কামনার শেষ নাই। এক কামনা পূর্ণ হইলে, আর এক নূতন কামনার সৃষ্টি হয়, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। কামনা পূর্ণ না হইলে, কামনা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মেরও শেষ হয় না। কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তি কামনা সিদ্ধ হইলে—অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিলে—কামনার শেষ, সুতরাং কর্ম্মেরও শেষ হয়—আর যাতায়াত বা জন্মমৃত্যু ঘটে না।

কর্ম্ম সংস্কারের হেতু, সংস্কার অদৃষ্টের কারণ। শত

শত কল্প অতীত হইলেও—কর্ম্মভোগ শেষ না হইলে, সংস্কার বা অদৃষ্টের শেষ হয় না।

না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।

(শ্রুতি)

কর্ম্মভোগ শেষ করিবার একমাত্র উপায় নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করা। নিষ্কাম কর্ম্মই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥

(গীতা—৯—২৭৷২৮)

হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে সমর্পণ কর। তাহা করিলে তুমি কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে মুক্ত হইবে—কর্ম্ম করিয়াও আমাকে অর্পণ করা হেতু তোমাকে কর্ম্মফলে বদ্ধ হইতে হইবে না, সুতরাং তুমি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধনমুক্ত ও সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা * হইয়া আমাকে পাইবে।

* কৃত কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করার নাম সন্ন্যাস। সেই সন্ন্যাসরূপ যোগ দ্বারা যাঁহার আত্মা বা চিত্ত যুক্ত হইয়াছে, তিনি সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা।

কামনা রহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে সংস্কারের বা অদৃষ্টের বশীভূত হইতে হয় না। এক দিকে কর্ম্ম দ্বারা পূর্ব্ব সংস্কারগুলির ক্ষয় হইতে থাকে, অপর দিকে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা নূতন সংস্কার আর সঞ্চিত হইতে পারে না। এইরূপে কর্ম্মক্ষয় হইলে, সংস্কার এবং অদৃষ্ট সেই সঙ্গে নাশ প্রাপ্ত হয়, তখন জ্ঞানের উদয় হইয়া মুক্তিলাভ ঘটে।

অদৃষ্ট কি? যাহা দেখা যায় না, যাহা দৃষ্টি বহির্ভূত, তাহাই অদৃষ্ট। কি দেখা যায় না? কি দেখিবার জন্য হৃদয় লালায়িত, অথচ তাহা দেখা যায় না? কোন পদার্থের জন্য অন্তর এত ব্যগ্র, বাসনা এত তীব্র, চিত্ত এত ব্যাকুল, অথচ তাহা দেখা যায় না! যাহা নয়নাতীত, কল্পনাতীত, দূরাদপিদূর অবস্থিত, হৃদয় কি তাহারই জন্য লালায়িত, প্রাণ কি তাহারই জন্য উচ্চাটন? অথবা কি প্রকারেই বা তাহা দেখা যাইবে? প্রকৃত চক্ষু থাকিলে ত দেখিব? বৈরাগ্য ও সৎসঙ্গরূপ চক্ষুর্দ্বয় ব্যতীত কি প্রকারে তাহা দেখিব? যাহা দ্বারা সেই নয়নাভিরাম বস্তু আবৃত, তাহাকে অপসারিত না করিলে—অদৃষ্টের মূল সেই মায়া দূরীভূতা না হইলে, আত্মার জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে না, ভগবদ্দর্শন ঘটিবে না, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে না। কর্ণো-পরি লেখনী অবস্থিতা, অথচ চতুর্দ্দিক লেখনীর অনুসন্ধান করিলাম; স্কন্ধদেশে গাত্র মার্জ্জনী সংরক্ষিতা, অথচ তাহার জন্য তন্ন তন্ন করিয়া ঘুরিলাম—কিছুতেই পাইলাম না।

অবশেষে জনৈক বন্ধু আমার ভ্রম অপনোদন করিয়া বলিলেন—"ঐ দেখ, তোমার কানে কলম, ঐ দেখ, তোমার ঘাড়ে গামছা।" আমি স্থির, শান্ত, প্রকৃতিস্থ হইলাম। তদ্রূপ অনুসন্ধানে পুনরায় যদি প্রবৃত্ত হই ;—ব্যাকুল অন্তরে, অবিচলিত হৃদয়ে, তীব্র বৈরাগ্য সহকারে, তন্ময়চিত্ত হইয়া, অভীপ্সিত পদার্থ প্রাপ্তি নিমিত্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তন্ন তন্ন করিয়া যদি পরিভ্রমণ করি, তাহা হইলে কখন না কখন অবশ্যই কোন পরদুঃখমোচনতৎপর মহাপুরুষ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া বলিবেন—

সবকে ঘটমে হরি হঁয়,
পহচানত্ নহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নহি জানত,
ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই।
সর্ব্বঘটে হরি, চিনৃতে কেহ নারি,
বৃথা ঘুরে মরি।
নাভির সুগন্ধ, মৃগ তাহে অন্ধ,
ধায় ঘুরি ফিরি।

বলিবেন—রে ভ্রান্ত। কোথায়, কাহার জন্য যাস্ ? যাঁহার জন্য তুই এত ব্যস্ত, ঐ দেখ্, তিনি তোর অন্তরে। আবরণ সরাইয়া ফেল্, নয়ন ভরিয়া দেখ্, উনি কে ? নিত্য, সত্য, বুদ্ধ, মুক্ত, ঐ যে জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষের মহাজ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে—ঐ যে প্রাদেশ পরিমিত

হৃদয়স্থ পুরুষোত্তমের প্রশান্ত মূর্ত্তি হইতে আনন্দলহরী উদ্বেলিত হইতেছে—ঐ যে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বৈকুণ্ঠ-বিহারী পদ্মপলাশলোচন শ্রীমধুসূদন ত্রিভঙ্গঠামে তোর অন্তরে বিদ্যমান! আবরণ সরাইয়া ফেল্, নয়ন ভরিয়া দেখ্,—ঐ যে আদিত্যাদি সমস্ত দেবগণ,—ঐ যে জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ ভূতগণ—ঐ যে তোর পিতা, মাতা, পুত্র, আত্মীয়গণ! আবরণ সরাইয়া ফেল্, নয়ন ভরিয়া আপনাকে দেখ্,—দেখ্, শেখ্, বল্, অথবা ভাব্—সোঽহং, সোঽহং, সোঽহং।

রাখীপূর্ণিমা।

মা, আজ রাখীপূর্ণিমা! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ কাটিয়া গেল; বর্ত্তমান অতীতে, কাল মহাকালে, স্মৃতি বিস্মৃতিতে মিশিয়া গেল, কত যোগ বিয়োগ, সৃষ্টি নাশ, জন্ম মৃত্যু ঘটিয়া গেল; আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া, না জানি কোথা হইতে, কি জানি কেন, সেই রাখীপূর্ণিমা আজ পুনরায় আসিল!

মা, আজ রাখীপূর্ণিমা! বর্ষে বর্ষে একবার করিয়া কতবার রাখীপূর্ণিমা আসিয়াছে, আরও কতবার আসিবে, কে জানে? কালের অনন্ত প্রস্রবণ হইতে এই একটী দিন আরও কতবার ঝরিবে, কে বলিতে পারে?

কিন্তু, মা, দেখিতে দেখিতে, আজ এক এক করিয়া উনিশ বৎসর অতীত হইয়া গেল, স্রোতের ন্যায় ভাসিয়া গেল—আনন্দকানন, অবিমুক্ত বারানসীক্ষেত্রে, ভাদ্রমাসে, বৃহস্পতিবারে. যে রাখীপূর্ণিমার দিনে, হাসিতে হাসিতে, নিজের জ্যোতিতে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া, মধ্যাহ্ন ভাস্করকে সাক্ষী রাখিয়া, তোমার সন্তানগণকে চিরদুঃখার্ণবে নিমজ্জিত করিয়া, ইহধাম চিরকালের জন্য তুমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ, আজ কোথায়, মা, সে দিন? শ্বেতবরণে, বরদে দেবি! শুভ্রবসনে মহামায়ে! পুণ্য পবিত্র মহাশ্মশান ক্ষেত্রে, অনন্ত শয্যায়, চির নিদ্রায় তুমি যখন শয়ানা, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, সাশ্রুলোচনে, তোমার পবিত্র শ্রীচরণযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া, তোমার পুত্রদ্বয় অন্তরে অন্তরে তোমার স্তব করিয়া যে শোকানন্দবিমিশ্রিত, অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় ভাব অনুভব করিতেছিল, আজ কোথায় মা, সে দিন? তোমায় সাক্ষাৎ "বিশ্বমাতা বিশ্বেশ্বরী" জানিয়া—"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে" জ্ঞানে তোমাতেই সেই অনাদিমধ্যান্ত, অবাঙ্‌মনসগোচর, আদ্যাশক্তিকে দর্শন করিয়া, পুলকে, আনন্দে, আত্মহারা হইয়া তোমার তনয়যুগল যখন স্তব করে—

ওঁ দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াং।
সর্ব্বলোকপ্রণেত্রীং চ প্রণমামি সদা শিবাং॥

মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাং।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহং॥
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বলোকভয়াপহাং।
ব্রহ্মেশ বিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদা উমাং॥
বিন্ধ্যস্থাং বিন্ধ্যনিলয়াং দিব্যস্থাননিবাসিনীং।
যোগিনীং যোগমাতাঞ্চ চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহং॥
ঈশানমাতরং দেবীমীশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াং।
প্রণতোঽস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীং॥
ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

আজ কোথায়, মা, সে দিন?

পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্যপুঞ্জ প্রভাবে, তোমার গর্ভে স্থান পাইয়া, তোমার অমল-ধবল-কমল-চরণযুগলের মাহাত্ম্যে আলোক দেখিলাম, জ্যোতি দেখিলাম, বুদ্ধি পাইলাম, জ্ঞান পাইলাম, ধন্য হইলাম, চরিতার্থ হইলাম।

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।
আগতাসি যতোদুর্গে মহেশ্বরি মদাশ্রমং॥

তোমার লীলা শেষ করিয়া তুমি চলিয়া গিয়াছ—তোমার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া তুমি অদৃশ্যা হইয়াছ। অনন্ত অনন্তে—আনন্দ পরমানন্দে মিশিয়াছে। কিন্তু মা, যাহা রাখিয়া গিয়াছ, তাহা অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়, অমূল্য, অতুল্য। তাহার অন্ত নাই, শেষ নাই, নাশ নাই, ধ্বংস নাই। তস্করের

তাহাতে লোভ জন্মে না, অনর্থ তাহাতে ঘটে না। তাহা জ্ঞানীর জ্ঞেয়, ধ্যানীর ধ্যেয়, সাধকের সেব্য, ভক্তের আরাধ্য। তাহা গুরুলঘুবৈষম্যবিবর্জ্জিত, দ্বেষহিংসাকলুষোৎপাদন শক্তিরহিত।

মা, যে ধনে তুমি ধনী, সে ধনে কি তোমার তনয় ধনী নয়? সে ধনে কি তোমার পুত্র অধিকারী নয়? সে ধন হইতে সে কি বঞ্চিত হইতে পারে? দয়াময়ী, কুপুত্র বটী, কিন্তু কুমাতা ত নও। কত সহিয়াছ, তবু হাস্যময়ী—কত দহিয়াছ, তবু আনন্দময়ী। শত শত অপরাধে অপরাধী, তবু তোমার অঙ্কগত,—শত শত দোষে দোষী, তবু তোমার চরণাশ্রিত। মন্ত্র জানি না, তন্ত্র জানি না; পূজা করি নাই, অর্চ্চনা করি নাই; সেবা করি নাই, বন্দনা করি নাই; তবু স্নেহরাশি ঢালিয়া দিয়াছ, স্নেহময়ী! কষ্ট দিয়াছি, যন্ত্রণা দিয়াছি; দুঃখ দিয়াছি, ব্যথা দিয়াছি—কখনও লেশমাত্র তাহা অনুভব কর নাই। কিন্তু ব্যথা দিয়া পাছে সন্তান ব্যথা পায়—কাঁদাইলে পাছে সে কাঁদে, তোমার ম্লানমুখ দেখিলে পাছে সন্তানের মুখ ম্লান হয়, তাহা ভাবিয়া আদর করিয়াছ, যত্ন করিয়াছ, সোহাগ ঢালিয়াছ, সুধা ঢালিয়াছ। আদরিণী মা আমার, গৌরবের জননী আমার—আজ নানা তাপে তোমার সন্তান অনুতপ্ত, নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট, নানা দুঃখে দগ্ধীভূত, কোথায় মা, তুমি? কে তাহাকে এখন অঙ্কে ধারণ করিবে, কে তাহার শিরশ্চুম্বন করিবে, কে তাহার

অশ্রুবারি মুছাইয়া দিবে? কে তাহাকে শান্তি দিবে, সুখ দিবে, অমিয় বর্ষণ করিয়া তাহার জীবনে আশা, স্ফূর্ত্তি, উৎসাহ, উদ্যম; তাহার দেহে বল, হৃদয়ে সাহস সঞ্চারিত করিয়া দিবে?

থাকুক সে কথা এখন। বলিতেছিলাম, যে ধনে তুমি ধনী, সে ধনে কি তোমার পুত্র ধনী নয়? সে ধন কি তোমার পুত্রের নয়? সে ধন কি তোমার পুত্র পায় নাই, পাইবে না, পাইবার যোগ্য নয়? যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করিয়া ধন বিতরণ করিবে কি? কর, তাহাই কর। যোগ্য কি না, আমি জানি না, তুমিই জান। যোগ্যতার কি লক্ষণ—কি থাকিলে, বা কি না থাকিলে, যোগ্য বলিয়া তুমি নিশ্চয় কর, তুমিই জান। যোগ্য যদি হই, অবশ্যই সে ধন তুমি দিবে। কিন্তু, মা, আমি অযোগ্য, ইহা জানি। তুমি আছ, ইহা যেমন আমার দৃঢ় প্রতীতি, ধ্রুব সত্য— আমি অযোগ্য, ইহাও তদ্রূপ আমার দৃঢ় প্রতীতি, ধ্রুব সত্য। তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি যেমন নিঃসংশয়, নিঃসন্দিহান, আমার অযোগ্যতা সম্বন্ধেও আমি তেমনি নিঃসংশয়, নিঃসন্দিহান। অযোগ্য বলিয়া কি ঠেলিয়া দিবে, মা? অযোগ্য বলিয়া কি ঘৃণা করিবে, মা! মা, মা বলিয়া অনুক্ষণ ডাকি—অথবা ঠিক ডাকা হয় কি না জানিনা, অযোগ্য বলিয়া আমার সে ডাক কি তোমার কাণে যায় না, মা? অযোগ্য, মা বলিয়া তোমায় ডাকাতে, তুমি কি বিরক্ত

হও মা? অহরহঃ দেখিতে পাই,বিরক্ত হইয়াও ভিক্ষুকের মন-কামনা সিদ্ধ করিয়া থাক। না হয় বিরক্ত হইয়া এ দীনের ইচ্ছাও পূর্ণ করিলে। কিন্তু বিরক্ত হইয়া দান করিও না, মা, নামে কলঙ্ক পড়িবে। তুমি তাহা গ্রাহ্য কর বা না কর, তোমার সন্তানের প্রাণে তাহা লাগিবে। বিরক্তির দান নিষ্ফল। সে দানে দাতা সুখী হয় না, গ্রহীতাও সুখী হয় না।

কিন্তু ফলাফলের কথা থাকুক—অযোগ্য কেন হইলাম, মা? তোমার গর্ভজাত সন্তাণগণের মধ্যে যোগ্য অযোগ্য, ভাল মন্দ, উত্তম অধম কেন হইল মা? তোমার সৃষ্টিতে এ বৈষম্য, এ তারতম্য, এ "উনিশবিশ" দেখিতে পাই কেন, মা? যোগ্যাযোগ্যের জন্য দায়ী কে? গর্ভে ধারণ করিলে তুমি, প্রশব করিলে তুমি, স্তন্য দিলে তুমি,—কেহ হইলাম যোগ্য, কেহ হইলাম অযোগ্য। লালন পালন করিলে তুমি, শিক্ষা দিলে তুমি, দীক্ষা দিলে তুমি—কেহ হইলাম যোগ্য, কেহ হইলাম অযোগ্য। যাহা বলাও তাহাই বলি, যাহা পড়াও তাহাই পড়ি, যাহা করাও তাহাই করি—কেহ হইলাম যোগ্য, কেহ হইলাম অযোগ্য। কোন কিছুতে নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই, স্বাধীনতা নাই, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তোমাতেই বিলুপ্ত—অথচ কেহ হইলাম যোগ্য, কেহ হইলাম অযোগ্য। এ প্রহেলিকা কে বুঝিবে মা? এ রহস্য কে ভেদ করিবে। এ নিগূঢ় তত্ত্ব ক্ষুদ্রবুদ্ধিবহির্ভূত।

আমার তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই—জানিবার, বুঝিবার শক্তিও নাই। অযোগ্য হই, যোগ্য করিয়া লও। আমাতে যাহা নাই, তাহা দেও; আমাতে যাহা থাকা অন্যায় মনে কর, তাহা দূরে নিক্ষেপ কর। অন্ধকারে থাকি, আলোকে লইয়া যাও, অধে থাকি, উর্দ্ধে তুলিয়া লও। অবোধ, অজ্ঞান শিশু বলিয়া ভুলাইয়া রাখিও না, মা।

কিন্তু কোথায় আসিয়া পড়িলাম। বলিতেছিলাম, ইহধাম ত্যাগ করিয়া তুমি চলিয়া গিয়াছ, অদৃশ্যা হইয়াছ। জিজ্ঞাসা করি, প্রকৃতই কি চলিয়া গিয়াছ? প্রকৃতই কি অদৃশ্যা হইয়াছ? ভ্রম, আমার ভ্রম—ইহা আমার ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত অনৃতোক্তি। কোথায় গিয়াছ, কোথায় যাইবে, অথবা কোথায় যাইতে পার? যেখানে ছিলে, সেইখানেই আছ, সেইখানেই থাকিবে। তুমি যে অচল, অটল, অক্ষয়, অব্যয়। তোমার মতি নাই, গতি নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, নাশ নাই, ধ্বংস নাই। তুমি কালাতীতা অথচ কালময়ী, ইচ্ছাতীতা অথচ ইচ্ছাময়ী, কল্পনাতীতা অথচ কল্পনাময়ী, বাক্যাতীতা অথচ বাঙ্ময়ী, গুণাতীতা অথচ গুণময়ী। অদৃশ্যা হও নাই, মা, অদৃশ্যা হইতে পার না। সৃষ্টি থাকিতে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান থাকিতে, তুমি কি কখন অদৃশ্যা হইতে পার? ছায়া থাকিতে কায়া নাই, ইহা কি প্রকারে ধারণা করিব? ধূম থাকিতে বহ্নি নাই, কি প্রকারে বুঝিব? কার্য্য থাকিতে কারণ নাই, ফল থাকিতে বীজ নাই, পদার্থ

থাকিতে তাহার উপাদান নাই, জড় থাকিতে প্রাণ নাই, বাহ্যাংশ থাকিতে অন্তরাংশ নাই, আমি থাকিতে আমার মা নাই—না, না, না, ইহা বুঝিতে পারি না, বুঝিতে ইচ্ছাও করি না। অলীক, অসঙ্গত, অসম্ভব কথা অন্তঃকরণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ ও অনিচ্ছুক। সৃষ্টি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইলে, সৃষ্টি প্রত্যক্ষ হইলে, স্রষ্টাও সেই সঙ্গে কেবল অনুমেয় নহেন, প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। তুমিই বলিয়াছ—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি॥

(গীতা—৬।৩০)

যে আমাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আমাতে দর্শন করে, সে আমাকে দেখে, আমি তাহাকে দেখি।

সর্ব্বভূতে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য—অবিশ্বাসিজনের চিত্তে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ ও তাহার লজ্জা নিবারণ উদ্দেশ্যে, প্রহ্লাদের জ্ঞানভক্তি বিমিশ্রিত স্তবে তুষ্ট হইয়া, স্তম্ভের মধ্য হইতে তুমি প্রকাশ হইয়াছিলে, কে না তাহা জানেন? পবননন্দনের বক্ষের মধ্য হইতে নিজের প্রশান্ত মূর্ত্তি ব্যক্ত করিয়া, জগতকে স্তম্ভিত, পুলকিত ও চরিতার্থ করিয়াছিলে, কে না তাহা জানেন? 'গাঙ্গিনীর তীরে' পাটুনীকে কৃতার্থ করিয়া তুমি অন্তর্দ্ধান হইলে, কে না তাহা জানেন? সরোবরের মধ্য হইতে শাঁখা পরা হাত দুখানি তুলিয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও শঙ্খ-

[illegible] দেখাইয়া তুমি তাঁহাদের ধন্য করিয়াছিলে, কে বা তাহা জানেন? ফলতঃ "জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, অনিলে, অনলে হরি, হরিময় ভূমণ্ডল," ইহা কবির কেবল কল্পনা নয়, ভক্তের কেবল উচ্ছ্বাস নয়, জ্ঞানীর কেবল জ্ঞানগর্ভ বচন নয়—ইহার মধ্যে গুহ্যাতি-গুহ্য সত্য, পরমাত্মতত্ত্ব অন্তর্নিহিত। পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, চন্দ্র, সূর্য্য, পঞ্চমহাভূত, যাবতীয় ইন্দ্রিয়গণ —সকলের মধ্যেই তুমি বিদ্যমান, অনুস্যূত, অন্তর্নিহিত। তুমি সকলের অজ্ঞেয় অথচ এই সমস্তই তোমার শরীর বা আবরক, সেই তুমি সকলেরই অন্তরাত্মা, নিয়ন্তৃ ও পরিচালিকা। তুমি নির্গুণ, নিরুপাধি, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার—অথচ তুমি ও সৃষ্টি এক, অভিন্ন, কোন পার্থক্য নাই!

> যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
> সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥
> যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
> ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥

গীতা ১৩—[illegible]৩৩

আকাশ যেমন সকল বস্তুতে অবস্থিত থাকিয়াও কোন বস্তু দ্বারা অনুলিপ্ত হয় না, তুমিও তদ্রূপ সকল দেহে অবস্থিত থাকিয়াও কাহারও গুণ দোষে অনুলিপ্ত হও না। সূর্য্য যেমন নিখিল জগৎকে প্রকাশিত করেন অথচ প্রকাশ্য বস্তুর কোন কর্ম্মে ও ধর্ম্মে লিপ্ত হন না; সর্ব্বভূতান্তরাত্মা

ক্ষেত্রজ্ঞ—তুমিও সকল ক্ষেত্রীকে প্রকাশিত কর, অথচ কাহারও ধর্ম্মে ও কর্ম্মে অনুলিপ্ত হও না।

ইহা যিনি বুঝিয়াছেন বা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তিনিই ধন্য, তিনিই সুখী। সংসারের যত ক্লেশ, দুঃখ—যত ক্রন্দন, আর্ত্তনাদ, যত হা হতোস্মি, হা দগ্ধোস্মির মূলে দ্বন্দ্বভাব, দ্বৈতবোধ। দ্বৈতবোধ অথবা পার্থক্যবোধ পরিণামী। পরিণামী ধ্বংসশীল। ধ্বংস ক্লেশোৎপাদক, দুঃখদায়ক। এই পার্থক্য বোধ অবিদ্যাবিজৃম্ভিত। অঘটন ঘটনাপটীয়সী অবিদ্যা বা মায়ার স্বভাবই এই যে, সে অদ্বৈতকে দ্বৈত, অপৃথককে পৃথক, অবাস্তবিককে বাস্তবিক বলিয়া বিবিধরূপে প্রকাশিত করে—চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া দেয়। একমেবাদ্বিতীয়ম্ মায়াবশতই পৃথক বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকেন। যাবৎ পার্থক্যভাব, দ্বৈতবোধ বিদূরিত না হইবে—যাবৎ জীবের প্রতি অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাব ও প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত থাকিবে, তাবৎ সুখ, শান্তি ও আনন্দভোগ,—ভক্তি, জ্ঞান ও মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত। স্থিরবুদ্ধি ও শ্রদ্ধাবান হইয়া নিয়ত তোমাকে যে ভাবে, তোমার বিষয়ে যে আলোচনা করে, তোমার গুণ যে কীর্ত্তন ও শ্রবণ করে; তোমার নামে যাহার প্রাণ কাঁদে, নয়ন ঝরে; যে ভাবে তুমি তাহার, সে তোমার; তুমিই সে, সেই তুমি,—অভেদ, অভিন্ন,অদ্বিতীয়,—সে তখন বুঝিতে পারিবে, দেখিতে পাইবে, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ মধ্যে

নিহিত থাকে, লবণখণ্ড যেমন জলে নিহিত থাকে, আকাশ যেমন পদার্থে নিহিত থাকে, সেইরূপ তুমি যাবতীয় ভৌতিক পদার্থে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, অন্তর্নিহিত, বিদ্যমান, বর্ত্তমান। তুমি ভিন্ন পদার্থের সত্তা নাই, তোমাকে ছাড়িয়া পদার্থের অনুভূতি হইতে পারে না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তুমিময়; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তুমিময়; নাম ও রূপ তুমিময়। কার্য্য ও কারণ তুমিময়; স্বরূপ ও বিকার তুমিময়, ছায়া ও কায়া তুমিময়। ব্যক্ত অব্যক্ত যাহা কিছু; দৃশ্যমান অদৃশ্যমান যাহা কিছু; কল্পনাবিষয়ীভূত বা কল্পনাবহির্ভূত যাহা কিছু; জাগ্রত, সুষুপ্তি ও স্বপ্নাবস্থার যাহা কিছু—তুমিময়। তুমিময়, তুমিময়, তুমিময়—মা তুমিময়। তোমার চরণে শত শত প্রণাম, শত শত প্রণাম, শত শত প্রণাম। ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

হরের্নামৈব কেবলম্।

কোথায় গেলে ভাই? এ ঘর, ও ঘর, সে ঘর খুঁজিলাম—এখানে, ওখানে, সেখানে গেলাম—এদিক, ওদিক, সেদিক দেখিলাম,—পাইলাম না।

কোথায় গেলে ভাই? ইহাকে, উহাকে, তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহার, উহার, তাহার নিকট অনুসন্ধান করিলাম—এটা, ওটা, সেটা ঘাঁটিলাম,—পাইলাম না।

কোথায় গেলে ভাই? কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী, তরু লতা; ভূচর, খেচর, জলচর; জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জের নিকট উপস্থিত হইলাম; নদ, নদী, জল; গিরি, গহ্বর, স্থল; বন, উপবন; নগর গ্রাম; তীর্থ তপোবন; গুহা আশ্রম ভ্রমিলাম; সাধু সন্ন্যাসী, জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য ব্যাকরণ, ইতিহাস পুরাণ, ন্যায় দর্শন, বেদ বেদান্তের শরণ লইলাম; রবি শশী, গ্রহ নক্ষত্র, অনিল অনল, আকাশ পাতাল, অহোরাত্রাত্মক কাল ভেদ করিলাম; যে যাহা বলিল, শুনিলাম যে যাহা বুঝাইল, বুঝিলাম, কিন্তু কোথায় গেলে ভাই?

গেলে গেলে, একটা কথা বলিয়া, একটা কথা শুনিয়া গেলে না? আশৈশব একত্র বাস, একত্র অধ্যয়ন, একত্র খেলা, একত্র ভ্রমণ—সমস্তই ভুলিলে? যখন যেখানে গিয়াছ, যখন যাহা করিয়াছ—দাদাকে জানাইয়া, দাদার অনুমতি লইয়া। আজ মহাপ্রস্থানে চলিয়া গেলে, দাদাকে ফাঁকি দিয়া? না, না, অসম্ভব, ফাঁকি দেও নাই। কর্ম্ম শেষ করিয়া, শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বিশ্রামগৃহে,—শয়নকক্ষে, চলিয়া গিয়াছ। খাটিয়াছ যথেষ্ট, কষ্ট পাইয়াছ যথেষ্ট—এখন নিদ্রা যাও। সংসারের নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর প্রহারে, অনিবার্য্য ঘাত প্রতিঘাতে, আধিব্যাধিতে জর্জ্জরিত কলেবর, ভগ্নহৃদয়, শুষ্কপ্রাণ, হতাশচিত্ত হইয়াছিলে—নিদ্রা যাও।

শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলে, অশ্রুনীরে ভাসিতেছিলে—সুখে নিদ্রা যাও। তোমায় ডাকিব না, বিরক্ত করিব না, জাগাইব না, তোমার ঘুম ভাঙ্গিব না—সুখে নিদ্রা যাও।

শুক্লবসনা, আলুলায়িতকেশা, ভালে সিন্দুরবিন্দুবিহীনা—কে ও রমণী ভূমিশয্যায় শুইয়া রে?

অঙ্গে নাই ভূষা, চক্ষু ভরা জল,
চিত্তে নাই আশা, দেহে নাই বল।
মনে নাই শান্তি, সংসারে সে টান,
মুখে নাই হাসি, সদা ম্রিয়মাণ।

কেও রমণী ভূমি শয্যায় শুইয়া রে?

দেখায় না মুখ, থাকে সে বিরলে,
জানায় না দুখ, কাঁদে অন্তরালে।
চায় না সম্পদ, ধ্যানে ঐ চরণ,
চায় না স্বরগ, পাইলে ঐ ধন।

কে ও রমণী ভূমি শয্যায় শুইয়া রে?

আবার একি শুনি? *

"উহুহুরে বাপধন!
ভেঙ্গে চুরে গেল মন,
আজ অভাগীর মাথা কেন হেন খেলি?

---

* পুত্র ও পতি বিয়োগ এক সপ্তাহেই ঘটে।

তুই আঁচলের হীরা
মাথা খোঁড়া, বুক চেরা
কাঙ্গালিনী মারে ফেলে কার কাছে গেলি ?"

* * * *

"জানেন অন্তরযামী
বড় অভাগিনী আমি,
অমূল্য রতন তুই বুক পুরাবার ;
অভাগী-মায়ের তরে
চাঁদ মুখে কথা ক-রে,
'মা' বলিয়া ডাক বাছা ! আর এক বার।"

* * * *

"তুমি না থাকিলে বুকে
অভাগী কি পোড়া মুখে—
জগতের কাছে মুখ দেখাইবে ফিরে ?
পোড়া বুক ফেটে যায়,
আয় যাদু ! কোলে আয় !
লুকায়ে রাখিগে—তোরে শত বুক চিরে।"

* * * *

"ওরে নিঠুর মাঘ মাস !
কি করিলি সর্ব্বনাশ !
আঁধারে ডুবালি মোর সর্ব্বস্ব ধন ;

হৃদি পিণ্ড ক'রে চূর
কেড়ে নিলি কোহিনূর
পোড়ালি আগুন দিয়ে বুকের বাঁধন !"

* * * *

"ওকি ও জাহ্নবী বক্ষে !
উহু ! কি দেখিনু চক্ষে !
হায় হায় কারা তোরা চিতা সাজাইলি ?
হোক ধরা ছাই ভস্ম
কাঙ্গালের সরবস্ব—
জ্বলন্ত অনল মাঝে কোন প্রাণে দিলি ?"
"ও দেহ—সোনার দেহ
দিস্‌নে চিতায় কেহ
অভাগীর সুখ সাধে দিস্‌নে আগুন ;
অন্ধের হাতের নড়ি
নিস্‌নে মিনতি করি,
কি দোষে এ ভিখারীরে করিবি রে খুন !"
"সহস্র মরণে হায় !
ভাঙ্গিব পায়ের ঘায়,
সহস্র গঙ্গার স্রোতে নিভাইব চিতে ;
আনিয়া অমৃত বায়ু
দিব কোটি পরমায়ু,
আমার সোনার চাঁদে কে আসিবি নিতে ?"

* * * *

"তবে বাবা! দেব বেশে
যাও চলি দেব দেশে—
মরণের পর পার অনন্ত যেথায়!
আজ দশ দিক ভরি
বল তোরা—হরি হরি
আমার 'ষষ্ঠী চন্দ্র' ঐ—নির্ব্বাণে মিলায়।" *

আমার হৃদয় কেন শূন্য, চিত্ত কেন শূন্য, মন কেন বিষণ্ণ হইল? আমার আশা চেষ্টা, উৎসাহ উদ্যম, আমোদ আনন্দ, সুখ শান্তি কে হরণ করিল? আমার হাসির সংসারে হাহাকার কে আনিল—সুধার সংসারে গরল কে ঢালিয়া দিল? আমার প্রমোদ উদ্যানটীকে মরুভূমিতে—আমার আনন্দ কাননটীকে শ্মশানভূমিতে কে পরিণত করিল? প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি—মরি, মরি, কি শোভা, কি সৌরভ!—কাহার উষ্ণ নিঃশ্বাসে শুকাইয়া এক এক করিয়া ঝরিয়া পড়িল?

ক্ষিপ্তের ন্যায়, অজ্ঞানীর ন্যায়, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। কেহ আমার দিকে তাকাইতেছে না, কেহ আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছে না, কেহ আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে না। যে যাহার কাজে ব্যস্ত, যে যাহার কর্ম্মে

* শ্রীমতী মানকুমারীর "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" হইতে, স্থানে স্থানে নিজের আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিয়া উদ্ধৃত করিলাম, তজ্জন্য তাঁহার নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

লিপ্ত, যে যাহার গন্তব্য পথে প্রধাবিত। আপনার লইয়াই সকলে ব্যস্ত,—পরের দিকে কে তাকায়, পরের কথা কে শোনে, পরের বিষয়ে কে ভাবে? আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, জগতে কয় জন? আমি হাসিলে হাসে, কাঁদিলে কাঁদে, জগতে কয় জন? সহানুভূতি জানায়, সমবেদনা দেখায়, জগতে কয় জন? বরং আমার সুখে, আমার উন্নতিতে, আমার প্রতিষ্ঠায়, তোমার দ্বেষ হিংসার উদয় হয়—আমার দুঃখে, আমার অবনতিতে, আমার নিন্দায়, তুমি সুখী হও। আমায় কেহ আশীর্ব্বাদ করিলে তুমি অভিসম্পাত কর, তোমার অভিসম্পাতে আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হইয়া যায় মনে কর। ভ্রান্ত, মূঢ়মতি, কলুষিতচিত্ত, একবার,—একবার মাত্র স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, ফলাফলের কর্ত্তা তুমি আমি নই, সুখ দুঃখের বিধাতা তুমি আমি নই, হাসি ক্রন্দনের মূল তুমি আমি নই। এই বিশাল সৃষ্টিতে তুমি আমি কীটাণুকীট, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, নগণ্য, জঘন্য। সুদূর গগন—অনন্ত আকাশের দিকে তাকাইয়া, একবার নিজের দিকে তাকাইও—স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, বুঝিতে পারিবে, তুমি কি, তুমি কত টুকু, তুমি কোথায়। স্বার্থ ছাড়িয়া দেও, ক্ষুদ্রত্ব ছাড়িয়া দেও, সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া দেও—হৃদয় উন্নত কর, দৃষ্টি বিস্তার কর, হস্ত প্রসারণ কর, পরমঙ্গলে ব্রতী হও, পরসেবায় নিযুক্ত থাক। জগৎ আপনার করিয়া লও, আপনাকে জগতে

মিশাইয়া দেও। তাহাতে জগৎ সুখী হইবে, তুমিও সেই সঙ্গে সুখী হইবে। সুখ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে চায় না। যে সুখ চায়, সেই পায়। কেবল চাহিবার উপযুক্ত হওয়া চাই। উপযুক্ত না হইলে, কোন জিনিষ পাওয়া যায় না। পাইলেও তাহা থাকে না, কারণ তাহাকে রাখিতে জানি না, তাহার আদর জানি না, তাহার মূল্য জানি না। সুতরাং চাহিবার উপযুক্ত হওয়া চাই। সুখ জিনিষটা সরল, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র কি না, তাই তাহাকে পাইতে হইলে সরল, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক,পবিত্র হওয়া আবশ্যক। পবিত্র হইলেই সুখ, সুখী হইলেই পবিত্র। বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি হও,বাহ্যাভ্যন্তরে সুখী হইবে। সুখী হইলে জগৎকে সুখী করিতে প্রবৃত্ত হইবে, অগ্রসর হইবে, ব্যগ্র হইবে। ভাল জিনিষ একা ভোগ করিতে ইচ্ছা করে না, তাহাতে সুখও হয় না। ভাল জিনিষ দুই হাতে বিতরণ করিতে—দুই হাতে লুটাইয়া দিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে,—আমি যাহা পাইয়াছি, জগৎ তাহা পাউক, জগৎ তাহা লুটিয়া লউক, জগৎ তাহা ভোগ করুক, জগৎ সুখী হউক—আমিও সেই সঙ্গে সুখী হই। জগতের আনন্দে আমার আনন্দ—জগতের নিরানন্দে আমার নিরানন্দ। তখন ইচ্ছা করে পরদুঃখ মোচন করিতে, পরের অশ্রুবারি মুছাইয়া দিতে, শোকার্ত্তের সহিত রোদন করিতে।

রোদন করিলেই কি শোক দূর হয়? শোকার্ত্তের বুক ফাটিয়া গিয়াছে, অশ্রুবারি শেষ হইয়াছে, শোক ত যায় নাই?

জল শুকাইয়া গিয়াছে, আগুন ধু ধু জ্বলিতেছে। সর্ব্বভুক্ কাল সমস্ত গ্রাস করিয়াছে, শোককে ত গ্রাস করিতে পারে নাই? কাঁদিয়া শোকানল নির্ব্বাণ করিবে? চিতানল শীতল হয়,—শোকানল শীতল হয় না। শ্মশানে চিতানলের চিহ্ন লোপ করিয়া আসিতে পার—হৃদয়ে শোকানলের চিহ্ন লোপ করিতে পারিবে না। কাঁদিলে শোক দূর হয় না, কাঁদিলে সুখ হয়। শোকার্ত্ত কাঁদে, শোক দূর করিবার জন্য নয়, আনন্দ ভোগ করিবার জন্য। যাহাকে হারাইয়াছি, তাহাকে স্মরণ করিলে চিত্তে আনন্দ হয়, আনন্দ দরবিগলিত ধারায় পতিত হয়। যাহাকে স্নেহ করি, ভাল বাসি, ভক্তি করি, তাহাকে দেখিতে না পাইলে, তাহার অদর্শনে, রোদন করি, তাহার মুখখানি মনে করিয়া, তাহার কথাগুলি মনে করিয়া, তাহার গুণরাশি স্মরণ করিয়া। হৃদয়ে যাহাকে অনুক্ষণ ভাবি, সে নিরুদ্দেশ হইলে, স্মৃতি তাহাকে হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়, চক্ষু তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে।

অশ্রুপাত রোধ করে, কাহার সাধ্য? হৃদয়ের উ[illegible]স রোধ করে, কাহার সাধ্য? অথবা রোধ করিবার প্র[illegible]জন কি? রোদনে কি কোন দোষ আছে? রোদন কি দুর্ব্বলতার চিহ্ন? রোদন কি লজ্জার বিষয়? সরযুর স্রোতে অনুজ লক্ষ্মণের তনুত্যাগে অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের রোদন; প্রভাসের তীরে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের ত্যক্ততনু অবলোকন করিয়া অর্জ্জুনের রোদন; সতীর শবদেহ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া

"ওই দেখ বারাণসী বিরাজিছে গগনে।" ৬৭ পৃষ্ঠা।
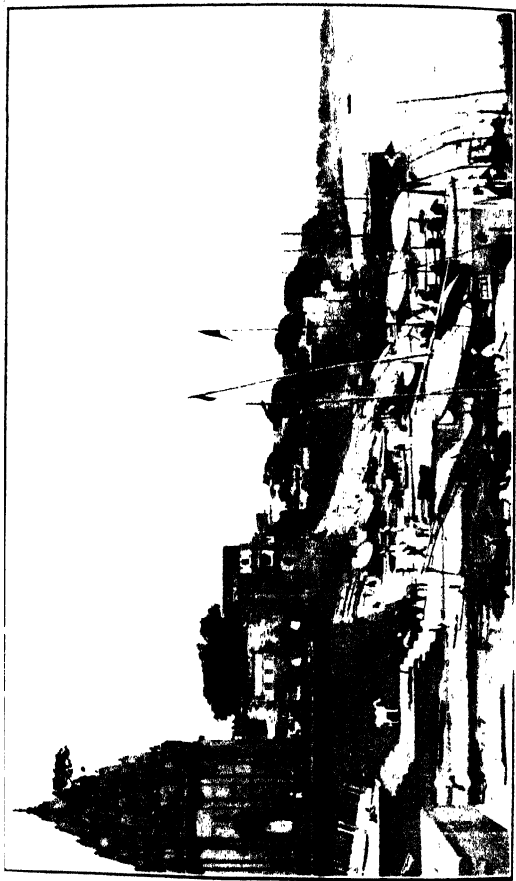
ভারতমিহির প্রেস, কলিকাতা।

পতির রোদন; পতির শবদেহ অঙ্কে ধারণ করিয়া সতীর রোদন;—ইহা কি লজ্জার কাজ? ধ্রুব প্রহ্লাদের রোদন, শাক্যসিংহের রোদন, জগাই মাধাইয়ের রোদন—ইহা কি লজ্জার কাজ? ভ্রম, ভ্রম, রোদন লজ্জার বিষয় নয়, রোদন পবিত্র জিনিষ। যাহাকে দেখিতে পাই না, যাহার দর্শন লাভ অসম্ভব মনে করি, অশ্রু তাহাকে চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়া দেয়। রোদনে জগৎ বশীভূত, রোদনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বশীভূত, রোদনে ভগবান বশীভূত, হস্তগত, হৃদয়গত। তাই রোদন করি—রোদন করিতে করিতে চলিয়াছি,—পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,—যাহাকে তাহাকে, যেখানে সেখানে, জিজ্ঞাসা করিতেছি—কোথায় আমার ভাই?

ঘুরিতে ঘুরিতে, বেড়াইতে বেড়াইতে, অবশেষে কাশী-ধামে, গঙ্গাতীরে, মণিকর্ণিকা ঘাটে উপস্থিত হইলাম। সর্ব্ব-শোকসন্তাপহারিণী, সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী, পতিতপাবনী মাতর্গঙ্গে! স্থান দে মা, কোলে নে মা—অধম সন্তানের দেহ, মন, প্রাণ শীতল করে দে মা! ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কেহ জিজ্ঞাসা করে না মা! স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেহ জিজ্ঞাসা করে না মা! দুঃখে মরি, কষ্টে মরি, শোকে মরি, কেহ জিজ্ঞাসা করে না মা! আমার দুঃখ কাহাকেও জানাইলে, মনের কথা কাহাকেও বলিলে, হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত করিলে, কেহ কিছু বলে না মা! সকলেই নীরব,

নিস্তব্ধ থাকে। মনুষ্য নীরব, আগমনিগম নীরব, প্রকৃতিও নীরব। তুমিও কি নীরব থাকিবে মা? না, না, তা থাকিবে না—থাকিতে পার না। নীরব থাকিলে সন্তাপহারিণী নামে কলঙ্ক পড়িবে।

তোমার নির্ম্মল, স্বচ্ছ, পুণ্য, পবিত্র সলিল হইতে ও কি কুল্ কুল্ ধ্বনি শুনিতে পাই মা? দিন নাই, রাত্রি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই,—ও কি কুল্ কুল্ ধ্বনি মা? শুনিতে মধুর, শরীর শীতল হয়, চিত্ত শান্ত হয়—ও কি কুল্ কুল্ ধ্বনি মা? ধ্বনিতে এত মাধুরী, ধ্বনির এত শক্তি, ধ্বনির এত গুণ? ধ্বনিতে শান্তি, না জানি, মা, তোমাতে বা আরও কত শান্তি! "যোজনানাম্ শতৈরপি" তোমার নাম গ্রহণ মাত্র সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হইয়া জীব যখন বিষ্ণুলোকে যাইতে পারে—যাহার নামের এত মহিমা, না জানি, মা, তাহার রূপের মহিমা, রূপের শক্তি কত! নামরূপধারিণী শক্তিময়ী মা, সুখদা মোক্ষদা, তরল তরঙ্গে দ্রবময়ী গঙ্গে! তোমার কূলে সুখ আছে, শান্তি আছে, আনন্দ আছে, তাই কি মা, কুল্ কুল্ রবে ত্রিতাপসন্তপ্ত তোমার সন্তানগণকে অবিশ্রান্ত ডাকিতেছ—"আয় তোরা, এই তোদের কূল, কূল, কূল?" তাই কি মা, জন্মমৃত্যুভয়সঙ্কুল, জলাম্বুশ্চন্দ্রচপল, মোহাচ্ছন্ন তোমার সন্তানগণকে অবিশ্রান্ত ডাকিতেছ—"আয় তোরা, এই তোদের কূল্, কূল্, কূল?" তাই কি তোমার স্নেহমাখা, সুমধুর কুল্ কুল্ধ্বনি শুনিয়া তোমার কূলে আসিয়াছি?

"মণিকর্ণিকাঘাট"—৺কাশীধাম। ৬৯ পৃষ্ঠা।

ভারত মিহির প্রেস, কলিকাতা।
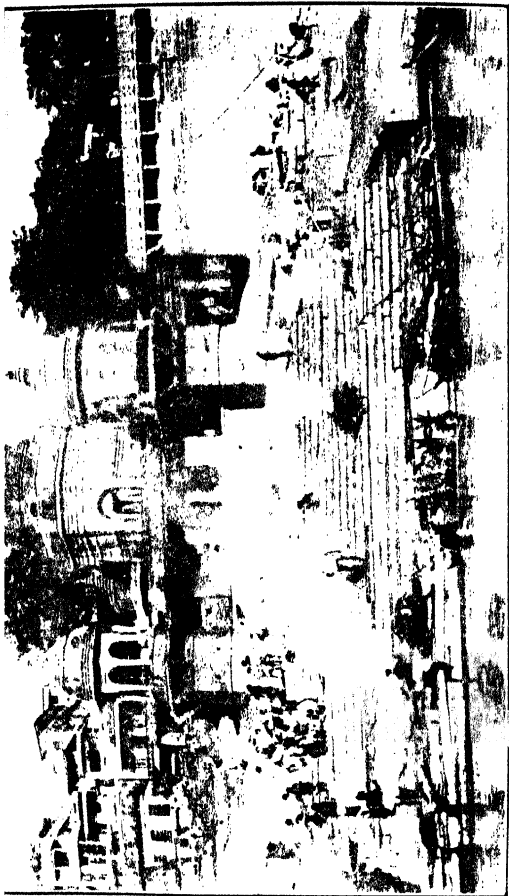
কি অপূর্ব্ব মনোরম স্থান। কি শান্তিময়, পরমানন্দপ্রদ পবিত্র ভূমি! এস্থানে আসিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়, চিত্ত স্থির হয়, মনে শান্তি আসে। লীলা বশতঃ,—অথবা জীবের মঙ্গলের জন্য, পুরুষ ও প্রকৃতি—শিব ও শিবানী—একত্র হইয়া, নিজ নিজ মণি ও কর্ণি নিক্ষেপ করিয়া, চিরকালের জন্য যে স্থান পবিত্র করিয়াছেন; মায়ামুগ্ধ, অজ্ঞানতিমিরাবৃত জীবের উদ্ধারের জন্য যে স্থান নির্ম্মাণ ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যেখানে মৃত্যু ঘটিলে সংসারক্লেশদগ্ধ জীবের নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ ধ্রুব, অবশ্যম্ভাবী—পুণ্য, পবিত্র মহাশ্মশান ক্ষেত্র অবিমুক্ত বারাণসী ধামে, জাহ্নবী তীরে, সেই মনোরম মহাতীর্থ মণিকর্ণিকা ঘাট এই। এ স্থানে আসিলে চৈতন্যের উদয় হয়, বৈরাগ্য জন্মে, জীবনের নশ্বরত্ব, ক্ষণভঙ্গুরত্ব, অকিঞ্চিৎকরত্বের সম্যক উপলব্ধি হয়। এখানে আসিলে মানবের দর্প চূর্ণ, গর্ব্ব খর্ব্ব—অহঙ্কার, অভিমান, রাগ, দ্বেষ, হিংসা তিরোহিত হয়। এখানে আসিলে লজ্জা ভয় থাকে না, বর্ণভেদ জাতিভেদ থাকে না, কুলমর্য্যাদা পদগৌরব থাকে না। এখানে গুরু লঘু নাই, হ্রস্ব দীর্ঘ নাই, ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র নাই, বড় ছোট নাই। এখানে জ্ঞানী অজ্ঞানী, পণ্ডিত মূর্খ, রাজা প্রজা, ধনী নির্ধনী, প্রভু ভৃত্য, সবল দুর্ব্বল, সুন্দর কুৎসিত, পাপী পুণ্যবান, সুখী দুঃখী, নর নারী, বালক বৃদ্ধ—সকলেই এক, সকলেরই এক দশা, এক গতি। এখানে ভেদ নাই, বৈষম্য নাই, ভ্রান্তি নাই। এখানে আছে

সাম্য, শান্তি, আনন্দ। পাঞ্চভৌতিক দেহ লইয়া যিনি যেখানেই থাকুন—হেমঅট্টালিকায় বা পর্ণকুটিরে—পাঞ্চভৌতিক দেহের অবসান এখানে, মাটীর দেহ মাটী হয় এখানে। মায়াজাল ছিন্ন হয় এখানে, অবিদ্যা, বিষয়বাসনা, কর্ম্মবন্ধন নাশ পায় এখানে। তুমি আমি বোধ লোপ পায় এখানে—ভেদবুদ্ধি, ভিন্নতাবোধ, পার্থক্য জ্ঞান দূর হয় এখানে। সমদর্শন, পরমার্থদর্শন, ব্রহ্মাত্মদর্শন ঘটে এখানে,—মৃত্যুর মৃত্যু, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ ঘটে এখানে। তাই জন্য এই শ্মশানক্ষেত্র মহাশ্মশানক্ষেত্র। তাই জন্য এই মহা শ্মশানক্ষেত্রে দেহ পাত করিতে জীব এত লালায়িত। ধন্য স্থানের মহিমা, ধন্য লীলাময়ের লীলা! মণিকর্ণিকার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া একদিন ভগবান শঙ্করাচার্য্য গাহিয়াছিলেন—

ত্বত্তীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাযুজ্যমুক্তিপ্রদৌ,
বাদন্তৌ কুরুতঃ পরস্পরমুভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে
মদ্রূপো মনুজোঽয়মস্তু হরিণা প্রোক্তঃ শিবস্তৎক্ষণা-
ত্তন্মধ্যাদ্ভৃগুলাঞ্ছনো গরুড়গঃ পীতাম্বরো নির্গতঃ॥
ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে যে পুন-
র্জ্জায়ন্তে মনুজাস্ততোঽপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ।
যে মাতর্ম্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিষ্কল্মষাঃ,
সাযুজ্যেঽপি কিরীটকৌস্তুভধরা নারায়ণাঃ স্যুর্নরাঃ॥২॥

কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গয়া,
তত্রেয়ং মণিকর্ণিকা সুখকরী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী।
স্বর্লোকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা,
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ ॥৩॥
গঙ্গাতীরমনুত্তমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্যুত্তমা,
তস্যাং সা মণিকর্ণিকোত্তমতমা যত্রেশ্বরো মুক্তিদঃ।
দেবানামপি দুর্লভং স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং,
পূর্ব্বোপার্জ্জিতপুণ্যপুঞ্জগমকং পুণ্যৈর্জনৈঃ প্রাপ্যতে ॥৪॥
দুঃখাম্ভোনিধিমগ্নজন্তুনিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতি-
র্জ্ঞাত্বা তদ্ধি বিরিঞ্চিনা বিরচিতা বারাণসী শর্ম্মদা।
লোকাঃ স্বর্গসুখাস্ততোঽপি লঘবো ভোগান্তপাতপ্রদাঃ
কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্ম্মার্থকামোত্তরা ॥৫॥
একো বেণুধরো ধরাধরধরঃ শ্রীবৎসভূষাধরো,
যোঽপ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরো গঙ্গাধরো মাধবঃ।
যে মাতর্ম্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি তে মানবা,
রুদ্রা বা হরয়ো ভবন্তি বহবস্তেষাং বহুত্বং কথম্‌ ॥৬॥
ত্বত্তীরে মরণন্তু মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লাঘ্যতে,
শক্রস্তং মনুজং সহস্রনয়নৈর্দ্রষ্টুং সদা তৎপরঃ।
আয়ান্তং সবিতা সহস্রকিরণৈঃ প্রত্যুদ্গতোঽভূৎ সদা,
পুণ্যোঽসৌ বৃষগোঽথ বা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্যতি॥৭॥
মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাস্নপনজং পুণ্যং ন বক্তুং ক্ষমঃ,
স্বীয়ৈরব্দশতৈশ্চতুর্ম্মুখধরো বেদার্থদীক্ষাগুরুঃ।

যোগাভ্যাসবলেন চন্দ্রশিখরস্তৎপুণ্যপারং গত—
স্তত্তীরে প্রকরোতি সুপ্তপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্ ॥৮॥
কৃচ্ছ্রৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং,
তৎ সর্ব্বং মণিকর্ণিকাস্নপনজে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ।
স্নাত্বা স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং,
তীর্ত্বা পল্বলবৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ ॥৯॥*

---

* হে মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে কোন জন্তু প্রাণত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ হরি ও হরের বিবাদ আরম্ভ হয়। হরি বলেন, "আমি ইহাকে মুক্তি প্রদান করিব" এবং হরও বলেন, "ইহার মুক্তি প্রদানে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার।" এইরূপে বিবাদ-প্রবৃত্ত হইলে হরি হরকে বলেন, "এই মনুষ্য আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হউক।" তৎক্ষণাৎ সেই মৃত দেহের মধ্য হইতে বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদচিহ্নিত পীতাম্বরধারী গরুড়বাহন পুরুষ নির্গত হইয়া বিষ্ণুদেহে লীন হয়।১।

যাহারা তপোবলে ইন্দ্রত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তাহারাও আপন আপন ভোগকালের অবসান হইলে পতিত হয়, পুনর্ব্বার মানবাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কালান্তরে কর্ম্মবশতঃ সেই সকল মনুষ্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া, পরে কীট পতঙ্গাদি হইয়া থাকে, কিন্তু মাতঃ মণি-কর্ণিকে! যে সকল মনুষ্য তোমার জলে একবার মাত্র নিমগ্ন হয়, তাহারা সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া কিরীট ও কৌস্তুভধারী নারায়ণ হইয়া থাকে। ২।

কাশীপুরী অতি ধন্যা অর্থাৎ সকলের প্রধান, ইহাকেই মুক্তিনগরী বলিয়া থাকে, ইনিও গঙ্গাদ্বারা অলঙ্কৃতা হইয়াছেন, সেই কাশীর সমীপেই মণিকর্ণিকা আছেন, ইনি সকলের সুখ প্রদান করেন আর মুক্তিও এই মণিকর্ণিকার আজ্ঞাবহা কিঙ্করী অর্থাৎ মণিকর্ণিকার আদেশেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। একদিন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া কাশী ও স্বর্গ এই উভয়কে তুলাদণ্ডে তোলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাশীর গুরুতা প্রযুক্ত কাশী ক্ষিতিতলে অবস্থিতা হইলেন এবং স্বর্গ লঘু বলিয়া তাহা ঊর্দ্ধদেশে গমন করিল। ৩।

তাই বলিতেছিলাম, ধন্য স্থানের মহিমা! ধন্য লীলাময়ের লীলা! এখানে আসিলে মলিনতা, সঙ্কীর্ণতা দূর হয়, হৃদয় নির্ম্মল, উদার হয়—নয়ন বিস্ফারিত হয়—দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়। জীব তখন দেখিতে পায়—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,"—দেখিতে পায় পদার্থ মাত্রই ব্রহ্মসত্তার বিকাশ—দেখিতে পায় ব্রহ্মসত্তাই নিখিল পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট, অনুস্যূত। নামরূপবিশিষ্ট পদার্থ ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত নয়, ব্রহ্ম

গঙ্গাতীর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্থান, সেই গঙ্গাতীর হইতেও কাশীকে উত্তমা বলিয়া জানিবে, আর কাশী হইতে মণিকর্ণিকার প্রাধান্য আছে, যেহেতু এই মণিকর্ণিকাতে প্রাণত্যাগ করিলেই স্বয়ং ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ সেই জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। আর এই মণিকর্ণিকা স্থান দেবগণেরও দুর্লভ এবং সর্ব্বপ্রকার পাপবিনাশে দক্ষ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহুপুণ্য বলেই—এই মণিকর্ণিকা স্থানে গমন করিতে পারে এবং যাহারা অতি পুণ্যাত্মা তাহারাই ইহাকে লাভ করিয়া থাকে।৪।

যে সকল জন্তু নিরন্তর দুঃখার্ণবে নিমগ্ন আছে, তাহারা কিরূপে সেই দুঃখসাগর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহা চিন্তা করিয়াই বিরিঞ্চি দুঃখার্ণবনিমগ্ন জন্তুগণের সুখ সম্ভোগার্থ এই বারাণসী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সকল লোকেই স্বর্গসুখাভিলাষী, বাস্তবিক ইহারা অতি লঘুচেতা, যেহেতু ভোগকালের অবসান হইলেই স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু কাশীপুরী ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করিয়া অবশেষে মুক্তি দিয়া থাকেন; সুতরাং বারাণসী যে জন্তুগণের সর্ব্বদা মঙ্গল সাধন করে, তাহাতে সংশয় নাই।৫।

যিনি গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ভূষণরূপে বিদ্যমান আছে, সেই মুরলীধর হরিও এক, আর যিনি শিরোদেশে গঙ্গাকে বহন করিতেছেন, সেই নীলকণ্ঠ শঙ্করও এক, কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে! যাহারা তোমার জলে নিমগ্ন হয়, তাহারা সকলেই রুদ্র বা হরিস্বরূপ হইয়া থাকে; তবে কিরূপে ইহাদিগের বহুত্ব হইতে পারে? অর্থাৎ তোমার মাহাত্ম্য বলে এক হরি ও এক শঙ্করও অনেক হইয়া থাকেন।৬।

সত্তাবিশিষ্ট,—ব্রহ্মময়। ফেন তরঙ্গ বুদ্ বুদাদি সমুদ্রেরই যেমন বিকার,—নামরূপধারী, উপাধিবিশিষ্ট নিখিল পদার্থ প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্ম চৈতন্যের তদ্রূপ বিবর্ত্ত বা বিকাশ মাত্র, বস্তুতঃ ব্রহ্মচৈতন্যাতিরিক্ত নয়। ব্রহ্ম ও পদার্থে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ বা পার্থক্য নাই। পার্থক্য দৃষ্ট হয় কেবল উপাধিতে—অর্থাৎ উপাধি ধরিয়া বিচার করিলে, ব্রহ্ম ও পদার্থ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উপাধিজনিত পার্থক্য দৃশ্যতঃ মাত্র, —স্বরূপতঃ বা বস্তুতঃ নয়। ব্রহ্ম হইতে পদার্থের এই বিবর্ত্ত দর্শন, এই ভিন্নতা বোধ, অবিদ্যাবিজৃম্ভিত। নিশা অবসানে

দেবি মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে মরণও মঙ্গলকর, দেবগণও এই মরণের গৌরব পূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি তোমার তীরে প্রাণত্যাগ করে, দেবরাজ সহস্রনয়ন দ্বারা তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক থাকেন। তোমার তীরে মৃতব্যক্তি যখন আগমন করিতে থাকে, তখন সূর্য্যদেব তাহাকে সহস্র কিরণ দ্বারা প্রত্যুদ্গমন করেন। ঐ ব্যক্তি বিষ্ণুত্ব কিংবা শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোন্ পুণ্যপুরে না প্রবেশ করিতে পারে? ৭।

চতুরানন বেদার্থের দীক্ষাগুরু, ইনি স্বীয় পরিমাণে শত বৎসরেও মধ্যাহ্ন কালীন মণিকর্ণিকা স্নানের ফল বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, কেবল একমাত্র চন্দ্রশেখর যোগাভ্যাসবলে তোমার পুণ্যমাহাত্ম্য জানিতে পারেন। যাহারা তোমার তীরে মহানিদ্রায় প্রসুপ্ত হয়, তাহাদিগের বিষ্ণুত্ব বা শিবত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৮।

বহু বহু ক্লেশকর তপস্যা ও শত শত কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যেরূপ পাপবিনাশ হইয়া পুণ্যসঞ্চয় হয়, একবার মাত্র মণিকর্ণিকাতে স্নান করিলে সেইরূপ পাপবিনাশ ও পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে, আর যে ব্যক্তি স্নান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই মনুষ্য ক্ষুদ্র জলাশয়ের ন্যায় সংসারসাগর পার হইয়া তেজোময় ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া থাকে। ৯।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ভগবান শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা" হইতে উদ্ধৃত।

সূর্য্যোদয় যেমন অবশ্যম্ভাবী—অন্ধকার দূর হইলে আলোক যেমন আপনা হইতেই আসে,অবিদ্যা অপগমে ভিন্নতা বোধ তদ্রূপ আপনা হইতেই অপসৃত হয়, থাকিতে পারে না। এই ভিন্নতা বোধ, পার্থক্যজ্ঞান দূর হইলেই, অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হয়। অদ্বৈতজ্ঞান—পরমার্থ দর্শন, ব্রহ্মাত্ম দর্শন সংঘটন করিয়া দেয়। অহঙ্কার তখন থাকে না, বিষয় বাসনা থাকে না, কর্ম্মবন্ধন থাকে না, যাতায়াত, পুনরাবৃত্তি, জন্ম মৃত্যু ঘটে না। ইহাই মৃত্যুর মৃত্যু ;—ইহাই মুক্তি, নির্ব্বাণ মুক্তি—একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি। এই মুক্তি, এই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির উপায় বিধান করিয়া দেন স্বয়ং বিশ্বনাথ,—মুক্তিলাভেচ্ছু জীবগণকে মুক্তিমার্গ দেখাইয়া দেন স্বয়ং বিশ্বনাথ ;—সেই নির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময়, প্রকাশস্বরূপ, দেশকালাতীত পূর্ণব্রহ্মাত্মচৈতন্যে—আপনাতে—মিশাইয়া লন, কারণাপন্ন করিয়া লন, স্বয়ং বিশ্বনাথ।

সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া—সেই পথের পথিক হইয়া, বিষ্ণুপদী গঙ্গার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গিয়াছ, কূল পাইয়াছ,—যাঁহার বিকাশ, তাঁহাতেই বিলুপ্ত, এক হইয়াছ। তাঁহাকে ভাবিলে, তোমাকে ভাবা হয় ; তাঁহাকে স্মরণ করিলে, তোমাকে স্মরণ করা হয় ; তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, তোমাকে দেখা হয় ;—তাঁহার সহিত মিশিতে পারিলে, সমস্ত একাকার, একীভূত, একমেবাদ্বিতীয়ম্ হইয়া যায়। এই চিন্তন, এই স্মরণ, এই দর্শন, এই সংমিশ্রণের

একমাত্র উপায়—হরের্নামৈব কেবলম্; এই এক, অদ্বিতীয়, অভিন্নাবস্থাপ্রাপ্তি, এই পরমানন্দময় ব্রহ্মত্ব লাভের একমাত্র উপায়—হরের্নামৈব কেবলম্; এই কৈবল্য নির্ব্বাণমুক্তি লাভের একমাত্র উপায়—হরের্নামৈব কেবলম্।

পথিক।

আমি পথিক—পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করি। গন্তব্য স্থান কোথায়, কোন পথে যাইলে সেস্থানে যাওয়া যায়, জানি না। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, অধ, ঊর্দ্ধ, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, ঈশান—দশদিক্ দেখিলাম, ঘুরিলাম, কিন্তু পথ পাইলাম না, চিনিলাম না, জানিলাম না।

আমি পথিক। দিবানিশি ঘুরিতেছি;—কত বর্ষ, কত কাল, কত যুগযুগান্তর কাটিয়া গেল ঘুরিতেছি, তথাপি গন্তব্যস্থান, গন্তব্যপথ সম্বন্ধে আজও আমি অন্ধ, অজ্ঞ।

আমি পথিক—লক্ষ্যভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট, যুথভ্রষ্ট, জ্ঞানভ্রষ্ট পথিক। সঙ্গীহীন, সহায়হীন, সম্পত্তিহীন, সম্বলহীন পথিক।

একা ঘুরিয়া বেড়াই, একাই যাই আসি। অন্যের পথ, আমার পথ নয়; অন্যের লক্ষ্য, আমার লক্ষ্য নয়; অন্যের গন্তব্যস্থান আমার গন্তব্যস্থান নয়। অন্ততঃ তাহাই ভাবি, তাহাই আমার ধারণা ও বিশ্বাস।

এক পথের পথিক, জগতে কয়জন? একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য, একই গন্তব্যস্থান, জগতে কয় জনের? একই আকাঙ্ক্ষা, একই আগ্রহ, একই আশা, একই চিন্তা, একই শিক্ষা, একই দীক্ষা, জগতে কয় জনের?

পথে বাহির হইয়া দেখি, প্রত্যেকেই পৃথক পথের পথিক। প্রত্যেকেরই পৃথক কামনা, পৃথক কল্পনা, পৃথক চেষ্টা, পৃথক উদ্যম। শ্রান্ত, ক্লান্ত, পথভ্রান্ত হইয়া, পথে দাঁড়াইয়া, একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায়, কোন্ পথে যাইব?" উত্তর পাইলাম—"তুমি কোথায় যাইবে, কোন্ পথে যাইবে, আমি কি জানি?" একটু অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায়, কোন্ পথে যাইব?" সে হাসিয়া বলিল—"পাগল না কি, নিজের গন্তব্যস্থান, গন্তব্যপথ জানে না, অথচ পথিক?" তৃতীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায়, কোন্ পথে যাইব?" সে বলিল—"ঠিক পথ ধরিয়া সোজা চলিয়া যাও।" বুঝিলাম, পথের কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা বৃথা,—বিড়ম্বনা মাত্র। বুঝিলাম, আমার সহিত উহারা এক পথের পথিক হইলে, সহযাত্রী হইলে—একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলে;—একই প্রাণে অনুপ্রাণিত, একই ভাবে বিভোর হইলে, এ উত্তর কখনই দিত না। তাই বলিতেছিলাম, একাই ঘুরিয়া বেড়াই, একাই যাই আসি।

প্রাতে সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়া, সমস্ত দিন পথে

পথে ঘুরিয়া বেড়াই, সন্ধ্যায় শ্মশানভূমিতে যাইয়া উপনীত হই। ইহাই আমার প্রাত্যহিক কার্য্য, দৈনন্দিন অনুষ্ঠান—জীবনপ্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনসন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহাই আমার পার্থিব ধর্ম্মকর্ম্ম। সূতিকাগৃহ, পথ, শ্মশানভূমি—শ্মশানভূমি, পথ, সূতিকাগৃহ, ইহাই চিনিয়াছি, ইহাই জানিয়াছি, ইহাতেই মজিয়াছি, ইহাতেই ডুবিয়াছি।

কতকাল এভাবে কাটিবে, কে জানে? কতকাল এই তিনটীকে লইয়া বাস করিতে হইবে, সংসার করিতে হইবে, কে জানে? এই তিনটী ছাড়া আরও কিছু জানিবার, বুঝিবার, গ্রহণ করিবার আছে কি না, কে বলিয়া দিবে? অথবা এই তিনটী পরিহার্য্য, কি অপরিহার্য্য, তাহাই বা কে বলিয়া দিবে? তিনটী থাকুক, ইহার একটী, মনে কর প্রথমটী, অর্থাৎ সূতিকাগৃহ, পরিহার করা সম্ভব কি না, তাহাই না হয় দয়া করিয়া কেহ বলিয়া দাও। প্রথমটী পরিহার করা যদি সম্ভব হয়, অপর দুইটীর সম্বন্ধে তাহা হইলে আর চিন্তা করিতে হইবে না; অপর দুইটীর সহিত সম্বন্ধ আপনি রহিত হইয়া যাইবে। কারণ তিনটীর সহিত পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিলেও, প্রথমটীই মূল, অপর দুইটী তাহার অভিন্ন সহচর মাত্র।

জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু মৃত্যু হইলে পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে, নাও হইতে পারে। জন্ম বা পুনর্জ্জন্ম কর্ম্মাধীন। কর্ম্মের প্রতি জন্ম বা পুনর্জ্জন্ম নির্ভর করে। কর্ম্মফল,

—সুখ দুঃখ—ভোগ করিবার নিমিত্তই জন্ম। ভোগ শেষ হইলেই জন্ম বা পুনর্জ্জন্মেরও শেষ। প্রজাপতি ব্রহ্মা জগতের যখন সৃষ্টি করিলেন, মৃত্যু বলিয়া কোন পদার্থ তখন তিনি সৃষ্টি করেন নাই। মৃত্যুর সৃষ্টি হয় পরে। মহাভারতে, শান্তিপর্ব্বে, পরমতত্ত্বজ্ঞানী ভীষ্মদেব, কুরুকুলনির্ম্মূলজনিত শোকে আকুল ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে যোগ উপদেশে বলেন :—

করিলেন ব্রহ্মা যবে সৃষ্টির পত্তন।
মৃত্যু হেন বস্তু নাহি হইল সৃজন॥
সংসার ব্যাপিল জীবে, কেহ না মরয়।
পৃথিবী না সহে ভার রসাতল হয়॥

* * * *
* * * *

ব্রহ্মার সদনে পৃথ্বী গমন করিল।
পৃথ্বী শান্তাইয়া তাঁর ভাবনা হইল॥
চিন্তিয়া গেলেন ব্রহ্মা যথা ভগবতী।
ললাট হইতে ঘর্ম্ম উপজিল অতি॥
সেই ঘর্ম্ম মৃত্যু নামে লইল জনম।
মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বড়ই বিষম॥
ব্রহ্মাকে চাহিয়া মৃত্যু বলিল বচন।
আজি সর্ব্বজীবে আমি করিব নিধন॥

* * * *
* * * *

এতেক বলিয়া মৃত্যু কাঁপে থর থর।
কহিলেন হাসিয়া মৃত্যুকে সৃষ্টিধর ॥

* * * *

* * * *

ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি দণ্ড কর জীবগণে
ব্যাধিরূপ ধরি তথা লাগিলা নিধনে ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক হবে বরেতে আমার।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে কর অধিকার ॥

সুতরাং দেখা গেল, অগ্রে জন্ম, পরে মৃত্যু—আদিতে সৃষ্টি, অন্তে ধ্বংস, এবং দণ্ড অথবা পুনর্জন্ম—ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম সাপেক্ষ।

কিন্তু সূতিকাগৃহ, পথ ও শ্মশানভূমি—অর্থাৎ জন্ম, কর্ম্ম ও মৃত্যু, এই তিনটীকে পরিহার করিবার পূর্ব্বে—অথবা এই তিনটী পরিহার্য্য—কি অপরিহার্য্য, ইহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, ইহাদিগকে পরিহার করিবার ইচ্ছা ও ব্যগ্রতা কেন হয়, ইহাদিগকে পরিহার করিবার হেতু ও কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রাপ্ত পদার্থ সহসা ত্যাগ করা, কি ত্যাগ করিবার কল্পনা করা, উচিত নয়। অধিগত বস্তু ভাল কি মন্দ, সৎ কি অসৎ, পরিণামী কি অপরিণামী, ইষ্টজনক কি অনিষ্টজনক, বিবেচনা ও বিচার করিয়া, তাহা পরিত্যাজ্য কি অপরিত্যাজ্য, সিদ্ধান্ত করা উচিত। শরীরী হইতে হইলেই—নামরূপ গ্রহণ করা মাত্রই, সূতিকা

গৃহ, পথ ও শ্মশানভূমি, এই তিনটীর সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়,—না হইয়া পারে না। এই সংস্থাপিত সম্বন্ধ—এই লব্ধ পদার্থ, সৎ কি অসৎ, পরিণামী কি অপরিণামী, সুখাবহ কি দুঃখাবহ, বিবেচনা ও বিচার করিয়া, তাহা পরিত্যাজ্য কি অপরিত্যাজ্য, সিদ্ধান্ত করা উচিত।

চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবে, এই তিনটীতেই একগুণ বিদ্যমান—রোদন। এই তিনটীরই এক গুণ,—রোদন। সূতিকাগৃহে যাও, শুনিবে রোদন; পথে যাও, শুনিবে রোদন; শ্মশানভূমিতে যাও, শুনিবে রোদন। রোদন ব্যতীত এ তিনটীতে আর কিছু নাই—অন্য কোন গুণ নাই। রোদন অভাবসূচক। অভাব হইলে—যাহা ভালবাসি তাহা হারাইলে, মনে দুঃখ হয়। দুঃখ রোদনের হেতু। কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম ভাবিয়া, সূতিকাগৃহে রোদন; কোথায় ছিলাম, কোথায় ঘুরিতেছি ভাবিয়া, পথে রোদন; কোথায় ছিলাম, কোথায় যাইতে হইবে ভাবিয়া, শ্মশানে রোদন। যেখানে ছিলাম, সেটী আমার ভাল বাসার স্থান, যাহা ছিল, তাহা আমার ভালবাসার ধন, অথবা যাহা ছিলাম, ভালই ছিলাম। এখন সেই স্থান, সেই বস্তু, অথবা সেই অবস্থা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি,—উহার অভাব দেখিতেছি, তাই সূতিকা গৃহে, পথে ও শ্মশানে রোদন করিয়া থাকি। এই রোদন যদি আনন্দের রোদন হইত, যদি ইহা আনন্দাশ্রু হইত, তাহা হইলে চিত্ত উদ্বেলিত

না হইয়া, ধীর, প্রশান্ত হইত। কিন্তু এ রোদনের মূল অভাব, দুঃখ। এ রোদন অভাবমূলক ও অভাবসূচক। তাই সূতিকাগৃহ, পথ ও শ্মশানভূমি পরিহার করিবার জন্য ইচ্ছা ও সঙ্কল্প।

কিন্তু ত্যাগ করিলে, ত্যক্ত বস্তুর বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করা উচিত ও আবশ্যক। শূন্যহস্ত, শূন্যচিত্ত হইয়া জীবন-ধারণ করা অসম্ভব। ত্যাগে তৃপ্তি, গ্রহণে বাসনা বৃদ্ধি, সত্য। কিন্তু যাহা গ্রহণ করিলে, আর কিছু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না,—যাহা পাইলে, আর কিছু পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হয় না, যে বস্তু লাভ করিলে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়, সমস্ত আকা-ঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, কোন বস্তু অপ্রাপ্য বা অপ্রাপ্ত থাকে না, তাহাই গ্রহণ কর।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

(গীতা—৬।২২)

ভগবদ্বাক্য শুনিলে ত? যাহা লাভ করিলে অন্য কোন লাভকেই তাহা অপেক্ষা অধিকতর লাভ বলিয়া মনে হয় না, যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হইতে হয় না, তাহাই গ্রহণ কর। ভক্তকবি, দেবতুল্য তুলসী দাসজী বলিয়া গিয়াছেন—

তুলসী যব জগমে আয়ো,
জগ হসে, তুলসী রোয়।

এয়সা কাম কর্ চলো,
কি তুম হসো জগ রোয়।

তুলসী যবে এলেন জগে,
জগ হাসে, তুলসী কাঁদে,
এমন কাজ ক'রে চলো,
যে তুমি হাসো, জগ কাঁদে।

আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—

গোধন, গজধন, বাজীধন,
অওর রতন ধন খান্।
যব্ আওত সন্তোষ ধন,
সব্ ধন ধূরি সমান॥

গোধন, গজধন, বাজীধন,
আর রতনের খনি।
ধূলির সমান, সব হয় জ্ঞান,
পাইলে সন্তোষমণি॥

সুতরাং রোদনের পরিবর্ত্তে হাসি, দুঃখের পরিবর্ত্তে সুখ, অভাবের পরিবর্ত্তে পূর্ণতা, নিরানন্দের পরিবর্ত্তে আনন্দ লাভের জন্য ধাবিত হইতে হইবে।

ধাবিত হইতে হইবে, সত্য; কিন্তু কোন্ পথে, কোন্ দিক্? আনন্দ কাননে যাইবার পথ, প্রবেশ দ্বার, দেখা-

ইয়া দিবে কে? হৃদয়ের বাসনা, অন্তরের আগ্রহ, মিটা-ইয়া দিবে, পূর্ণ করিয়া দিবে কে? আনন্দহিল্লোলে ভাসিতে থাকিব, মিশিয়া যাইব, আত্মহারা হইব, আনন্দময় হইব—ইহা কি কল্পনা? ইহা কি স্বপ্ন? ইহা কি বাতুলতা? কিছুই ত বুঝি না—কিছুই যে দেখি না। বিষণ্ণ বদনে, বিমর্ষ চিত্তে, নিরাশ হৃদয়ে, অথচ আকুল প্রাণে বসিয়া আছি;—পুণ্য, পবিত্র বারাণসী ধামে, শান্তি-নিকেতন, পরম রমণীয় বরুণার সঙ্গমস্থলে একাকী বসিয়া আছি। অদূরে "আদিকেশবের" প্রস্তরবিনির্ম্মিত সুরম্য মন্দির। সৌভাগ্যবান যাত্রিগণ "আদিকেশব" দর্শন করিয়া, ধন্যজীবন হইয়া, নিজ নিজ আলয়ে ফিরিয়া গিয়াছেন বা ফিরিয়া যাইতেছেন। দিনমণি অস্তমিত। সন্ধ্যা সমাগতা। সন্ধ্যার আরতি শেষ হইয়াছে। স্থানটী একেই অপেক্ষাকৃত জনমানবশূন্য, কোলাহলশূন্য,—নিশাসমাগমে আরও নির্জ্জন, নিস্তব্ধ হইল—যেন চিন্তাকুল চিত্তকে নিরুপদ্রবে চিন্তা করিবার সুযোগ ও সুবিধা ঘটাইয়া দিল। বৈশাখ মাস, শুক্ল পক্ষ, পূর্ণিমা নিশা। সুস্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণ মৃদু মন্দ বহিতেছে। নীলাকাশে তারকারাজি পরিবেষ্টিত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জাহ্নবী ও বরুণার স্বচ্ছসলিলে প্রতিভাত হইতেছে। জ্যোৎস্নাবিধৌত স্থানটী প্রকৃতি সতীর ক্রীড়া-স্থল হইয়াছে। ব্রীড়া ত্যাগ করিয়া কৌমুদীপতির সহিত প্রকৃতি হাসিতেছে, নাচিতেছে, খেলিতেছে—আমি বসিয়া

বরুণাসঙ্গম ও আদিকেশবের মন্দির—কাশীধাম। ৮০ পৃঃ

আছি, ভাবিতেছি। কি ভাবিতেছি, জানি না। ভাবনার আদি নাই, অন্ত নাই, মূল নাই, কূল নাই, অথচ ভাবিতেছি। প্রকৃতি হাসিতেছে, আমি কাঁদিতেছি। প্রকৃতি নাচিতেছে, আনন্দে বিভোর হইয়া—আমি বসিয়া আছি, নিরাশ, নিরানন্দ চিত্তে। আমি কি তবে প্রকৃতি ছাড়া? প্রকৃতি হইতে আমি কি তবে ভিন্ন? আমি কি প্রকৃতির কেহ নই? প্রকৃতির সহিত আমার নিকট বা দূর কোন সম্বন্ধ কি নাই? ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, বরুণাসঙ্গমে বসিয়া আছি, অথচ স্থানমাহাত্ম্য বুঝিলাম না, সঙ্গম কাহাকে বলে জানিলাম না। জানিব কি প্রকারে? ঘরের খবর রাখিব কি প্রকারে?

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু
স্তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

(কঠ ৪।১)

আমার গতি যে বহির্ম্মুখী, অন্তরাত্মামুখী নয়। স্বয়ং স্বয়ম্ভূ বহির্ম্মুখী করিয়া আমার সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি কি করিব? বহির্ম্মুখী হইয়া, বহির্দৃষ্টিতে দেখিতেছি, বরুণার জল গঙ্গার জলে মিশিয়াছে, বরুণা ও গঙ্গায় সংযোগ ঘটিয়াছে, মিলন ঘটিয়াছে—বরুণা ও গঙ্গা এক, অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। জলে জল মিশিয়াছে, প্রাণে প্রাণ মিশিয়াছে, অথচ নাম লোপ পায় নাই, বিদ্যমান রহিয়াছে—এখনও বলিতেছি, চিরকাল বলিব—বরুণা, গঙ্গা। পদার্থ

অনন্তে মিশিয়া যায়, নাম থাকিয়া যায়, স্মৃতি জাগরূক থাকে। পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে নাম লোপ পাইলে, স্মৃতি লোপ পাইলে, জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইত। লীলাময়ের বিচিত্র লীলা, দয়াময়ের অনন্ত দয়া, তাঁহার সৃষ্টিতে নাশ হইবার মত কিছুই তিনি সৃষ্টি করেন নাই—তাঁহার রচনা কৌশলে এমন কিছুরই সৃষ্টি হয় নাই যাহা ধ্বংস বা উপলব্ধির অতীত হইতে পারে।

পদার্থ মাত্রকেই তিনি দুই অংশে বিভাগ করিয়াছেন—একটী নামরূপাত্মক অংশ, অপরটী নামরূপে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তার অংশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ নামরূপবিশিষ্ট। এমন পদার্থ নাই, যাহার নামরূপ নাই। এই নামরূপের নিজের কোন সত্তা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মসত্তা নামরূপের সত্তা, ব্রহ্মশক্তি নামরূপের শক্তি, ব্রহ্মতেজ নামরূপের তেজ। ব্রহ্মসত্তাই নামরূপে অনুস্যূত, অনুপ্রবিষ্ট। নামরূপ ব্রহ্মসত্তাময়, ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত নয়। ফলতঃ নামরূপই ব্রহ্ম। পক্ষান্তরে, নামরূপে অনুস্যূত সত্তা ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধির দ্বার—ব্রহ্মসত্তা বুঝিতে পারি, নামরূপে অনুস্যূত সত্তার সাহায্যে। ছায়ার যেমন কায়া হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই, প্রতিবিম্বের যেমন বিম্ব হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই—শক্তির যেমন শক্তিমান হইতে, গুণের যেমন গুণী হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তদ্রূপ নামরূপেরও পদার্থ হইতে পৃথক অস্তিত্ব নাই। নামরূপ ও পদার্থ পরস্পর ওত

প্রোতরূপে বিজড়িত। নামরূপ ছাড়া পদার্থ নাই, পদার্থ হইলেই তাহার নামরূপ আছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে নামরূপ ও পদার্থ পৃথক বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে, কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে নামরূপ ও পদার্থ অপৃথক, অভিন্ন, এক। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বরুণা ও বরুণার জল, গঙ্গা ও গঙ্গার জল পরস্পর পৃথক বলিয়া বোধ হইলেও, পরমার্থ দৃষ্টিতে বরুণা ও বরুণার জল, গঙ্গা ও গঙ্গার জল পরস্পর অপৃথক, অভিন্ন, এক।

সূর্য্যকিরণ সমুদ্রজল আকর্ষণ করে। সেই জল মেঘাকার ধারণ করে। সেই মেঘ হইতে জল বর্ষণ হয়। সেই জল বরুণা, গঙ্গাদি নদীর জলে পতিত হয়। তখন লোকে সেই জলকে সমুদ্রের জল বলে না—বরুণা, গঙ্গাদির জলই বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক কি উহা বরুণা, গঙ্গাদির জল? উহা কি সমুদ্রের জল নয়? আবার বরুণা, গঙ্গাদি নদী সমুদ্রে পতিত হইয়া আপনাদের জল গুলির "ভিন্নতা" হারাইয়া বসে—তখন তাহাদের জল লবণাম্বু হইয়া যায়। যেখানকার জল সেইখানেই যায়—মধ্যে কেবল নামান্তর গ্রহণ, রূপান্তর গ্রহণ।

সোনার "অনন্ত" সোনা ভিন্ন আর কিছু নয়। সোনার সত্তাই "অনন্তের" সত্তা। সোনা হইতে "অনন্তের" স্বাধীন, পৃথক সত্তা নাই। সোনা "অনন্ত" আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া, একটা স্বতন্ত্র নামরূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়া,

অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, নিজের নিজস্ব, সত্তা, স্বর্ণত্ব হারায় নাই, হারাইতে পারে না। "অনন্ত" হইতে স্বর্ণসত্তাকে তুলিয়া লও, "অনন্তের" অন্ত হইবে—'অনন্ত আর থাকিবে না, সোনা যেমন তেমনিই থাকিবে। "অনন্ত" সোনায় বিলুপ্ত হইবে,—"অনন্ত" অনন্তে মিশিয়া যাইবে। ইচ্ছা হয়, সেই সোনা হইতে পুনরায় কোন অলঙ্কার প্রস্তুত কর—"অনন্তই" হউক, আর "হারই" হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না, উহা কেবল নামরূপ মাত্র, সোনার অবস্থান্তর মাত্র—অলঙ্কারের পুনর্জ্জন্ম হউক, দেখিবে সেই স্বর্ণসত্তা লইয়াই তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখিবে সেই স্বর্ণ সত্তাতেই কালে তাহা বিলীন হইয়াছে—দেখিবে আদি মধ্য অন্ত উহা স্বর্ণসত্তাময়, উহা স্বর্ণই, আর কিছু নয়। নির্ম্মাণের পূর্ব্বে নামরূপগুলি স্বর্ণসত্তায় অব্যক্তভাবে অবস্থিত ছিল—সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপগুলি আত্মসত্তায় অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে।

মাটীর পুতুলের মাটী হইতে পৃথক সত্তা নাই। মাটীই পুতুলের সত্তা। পুতুলটী মাটীময়—পুতুলই মাটী। মাটী ও পুতুল, স্থূল দৃষ্টিতে পৃথক পৃথক বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এক, অভিন্ন, অভেদ। পুতুল মাটীর নামরূপান্তর মাত্র, অবস্থান্তর মাত্র—বস্তুতঃ পুতুল মাটী ছাড়া নয়। মাটীসত্তা পুতুলে অনুস্যূত, অনুপ্রবিষ্ট, অন্তর্নিহিত। মাটীসত্তাতেই পুতুলের সত্তা। মাটীসত্তা ভিন্ন পুতুলের

স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই। মাটীসত্তা হইতে পুতুলকে বিচ্যুত কর, দেখিবে পুতুল নাই, মাটীতে মিশিয়াছে, মাটী হইয়াছে। ইচ্ছা হয়, মাটী হইতে পুনরায় পুতুল প্রস্তুত কর—অশ্বই হউক, আর হস্তীই হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না, উহা কেবল নামরূপ মাত্র, মাটীর অবস্থান্তর মাত্র—পুতুলের পুনর্জ্জন্ম হউক, দেখিবে, সেই মাটীসত্তা লইয়াই তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখিবে কালে সেই মাটীসত্তাতেই তাহা বিলীন হইয়াছে, দেখিবে আদি মধ্য অন্ত উহা মাটী-সত্তাময়, উহা মাটীই, মাটী ভিন্ন আর কিছু নয়। নির্ম্মাণের পূর্ব্বে পুতুলটী—নামরূপগুলি মাটীসত্তায় অব্যক্তভাবে অবস্থিত ছিল,—সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপগুলি আত্মসত্তায় অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে।

অজ্ঞ ব্যক্তি, মায়ামুগ্ধ ব্যক্তি, স্থূল দৃষ্টিতে, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, নামরূপ দেখিয়া আসল কথা, যথার্থ তত্ত্ব ভুলিয়া যায়;—ভুলিয়া যায় যে নামরূপ আত্মারই বিকাশ, ব্রহ্ম সত্তারই জ্যোতি, অভিব্যক্তি,—ভুলিয়া যায় যে নামরূপ ব্রহ্মসত্তাবিশিষ্ট, ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত নয়। নামরূপাদি আত্ম-স্বরূপ হইতে "ভিন্ন" বলিয়া অজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তে প্রতিভাত হয়। এই ভিন্নতাবোধ, দ্বৈতজ্ঞান, যত অনর্থের মূল, অমঙ্গলের নিদান, দুঃখের হেতু। জন্মের কারণ, সূতিকাগৃহের ভিত্তি, শ্মশানের মূল এই দ্বৈতভাব, ভিন্নতাবোধ। আত্মবিস্মৃত এই ভিন্নতাবোধের জন্য চিরকাল কি ঘোর অশান্তি ভোগ।

তোমার আমার দেহ—তুমি আমি—এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—এই অনন্তসৃষ্টি, সেই অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, অবাঙমনস-গোচর আত্মসত্তার জ্যোতি, বিকাশ, অভিব্যক্তি। সেই আত্মসত্তা হইতে তুমি আমি পৃথক নই,—এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পৃথক নয়,—এই অনন্ত সৃষ্টি পৃথক নয়। আমরা সেই আত্মসত্তাতেই বলীয়ান, সেই আত্মসত্তাতেই শক্তিমান, সেই আত্মসত্তাতেই তেজীয়ান, সেই আত্মসত্তাতেই গরীয়ান। আমাদের ক্রিয়া কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ, যপতপ, পূজা বন্দনা; আমাদের বল বিক্রম, সৌর্য্যবীর্য্য, দর্পদম্ভ, তেজ গৌরব, অহঙ্কার অভিমান; আমাদের প্রাক্তন পুরুষকার, আমিত্ব, অস্তিত্ব, সত্তা, সেই আত্মসত্তাকে লইয়া, সেই আত্মসত্তাতেই অন্তর্নিহিত, অনুপ্রবিষ্ট। আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, স্বতন্ত্র আমিত্ব নাই, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই,—স্বাতন্ত্র্য নাই, স্বাধীনতা নাই—ভেদ, পার্থক্য, ভিন্নতা, দ্বিতীয়ত্ব, বিশেষত্ব নাই। আমরা তদ্‌গত, তন্ময়, তদন্তর্ভুক্ত, তদন্তর্নিহিত—আমরা সেই। রবি শশী, গ্রহ নক্ষত্র, বায়ু বরুণ, অনিল অনল, দেবতা গন্ধর্ব্ব, মানব দানব, জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি নিখিল পদার্থ তাঁহারই জ্যোতি, তাঁহারই বিকাশ, তাঁহারই সত্তার অভিব্যক্তি।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

(গীতা—১৩।১৫)

যেমন জলতরঙ্গের ভিতর ও বাহির সমস্তই জল, যেমন সুবর্ণকুণ্ডলাদির ভিতর ও বাহির সমস্তই সুবর্ণ, যেমন মৃন্ময় ঘটাদির ভিতর ও বাহির সমস্তই মাটী, তাহা ছাড়া আর কিছু নয়, সেইরূপ চরাচর ভূতের বাহ্যাভ্যন্তর সমস্তই তিনি—তিনি ভিন্ন এই চরাচর জগতে, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সৃষ্টিতে আর কিছু নাই।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥

(ঈশোপনিষৎ—৬।৭)

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

(গীতা—৬।২৯)

আত্মাতে সর্ব্বভূত, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন,—ইহাই ব্রহ্ম-দর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রাপ্তি, ব্রহ্মানন্দ। এই ব্রহ্মজ্ঞান, এই পূর্ণ অদ্বৈতবোধ যাঁহার চিত্তে সমাহিত, বদ্ধমূল, সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি ঘৃণাশোকমোহভয়াদিবিবর্জ্জিত, জীবন্মুক্ত। ঘৃণা তাঁহার চিত্তে উদয় হইতে পারে না, শোক তাঁহকে সন্তপ্ত করিতে পারে না *, মোহ তাঁহাতে মলিনতা উৎপাদন করিতে পারে না, ভয় তাঁহাকে বিহ্বল করিতে পারে না,—তিনি

* তরতি শোকং আত্মবিৎ।

যাবতীয় বিক্ষোভের অতীত, সর্ব্বপ্রকার বিকারবহির্ভূত। তাঁহার মলিনতা যাইয়া স্বচ্ছতা, ভ্রান্তি যাইয়া জ্ঞান, অন্ধকার যাইয়া জ্যোতি, বন্ধন যাইয়া মুক্তি, বহুত্ব যাইয়া একত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তাঁহার এখন ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই; জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; সূতিকাগৃহ নাই, শ্মশানভূমি নাই। তাঁহাতে এখন ক্ষুদ্রত্ব নাই, মহত্ত্ব আছে; সঙ্কীর্ণতা নাই, ঔদার্য্য আছে; অভাব নাই, পূর্ণতা আছে; দুঃখ নাই, আনন্দ আছে। তিনি এখন অজয়, অমর, অক্ষয়, অব্যয়, অনাদি, অনন্তে মিশিয়াছেন—তিনি এখন সমদর্শী, আত্মদর্শী, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে বিলীন। এই ভাব, এই জ্ঞান থাকিতে থাকিতে, তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশাইতে পারিলে, তিনি নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই, ইহা ভগবদ্বাক্য।

> অন্তকালে চ মামেব স্মরণমুক্ত্বা কলেবরম্।
> যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
>
> (গীতা—৮।৫)

অন্তকালেও যে ব্যক্তি কেবল আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করে, সে আমার স্বরূপত্ব লাভ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেবল যে অন্তকালে ভগবানকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলেই ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি ঘটে, তাহা নয়।

যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

(গীতা—৮৷৬)

জীবদ্দশাতেও যে যাহাকে নিরন্তর ভাবে, সে তদ্ভাবাপন্ন হয়। নন্দীকেশ্বর সর্ব্বদা সদাশিবের চিন্তা করিতে করিতে, জীবদ্দশাতেই শিবরূপী হইয়াছিলেন। তৈলপায়িকা কাঁচপোকার ভয়ে ভীত হইয়া, নিয়ত কাঁচপোকা ভাবিতে ভাবিতে, জীবিতাবস্থাতেই নিজ দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কাঁচপোকার ভাবাপন্ন হইয়া যায়। জীবন মুক্তিই বল, আর নির্ব্বাণ মুক্তিই বল, এই স্বরূপত্ব লাভই মুক্তি। বিকার নাশ হইয়া, যাঁহার বিকার তাঁহাতে বিলীন হওয়াই, তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ;—ইহাই মুক্তি।

যিনি জীবন্মুক্ত, তিনি নির্ব্বাণ মুক্তিলাভের অধিকারী। অভ্যাস, বৈরাগ্য, সংযম, বিশ্বাস—মুক্তিলাভের ইহাই সোপান ও উপায়। এই উপায় দ্বারা দুর্নিগ্রহ মনের উপর প্রাধান্য লাভ করা যায়, চঞ্চল মনকে স্থির করা যাইতে পারে। মন স্থির হইলে তদধীন ইন্দ্রিয়গুলিও স্থির হয়। ইন্দ্রিয়গণ মনেরই দাস, মনেরই সেবক, মনেরই আজ্ঞাবহ—মন কর্ত্তৃক তাহারা পরিচালিত। মন তাহাদের কর্ত্তা, প্রবর্ত্তক। ইন্দ্রিয়গণ কাজ করে মনের আজ্ঞানুসারী, মনের ইচ্ছামত। ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, ফলাফল বিবেচনা না করিয়া, তাহারা মনের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে—

মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে থাকে। মনকে জয় করিতে পারিলে, বশে আনিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত হয়। কিন্তু মনকে বশীভূত করিবে কি প্রকারে—জয়লাভের উপায় কি?

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

(গীতা—৬।২৬)

অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতেই স্থির করিবে।

এইরূপ উপদেশই এক দিন রঘুকুলগুরু বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রণাম করিয়া, ভক্তি সহকারে, বশিষ্ঠদেবকে এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন—গুরো! আমার শক্তি, ক্ষমতা, বিক্রম জগতে অবিদিত নাই। রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি দুর্জ্জয় বীরগণ আমারই হস্তে নিহত। ইচ্ছা করিলে সমুদ্র শোষণ করিতে পারি, হিমাদ্রি চূর্ণ, বিচূর্ণ করিতে পারি—কিন্তু, গুরো, আমি আমার মনকে জয় করিতে পারিতেছি না, আত্মবশে আনিতে পারিতেছি না। মনের নিকট পরাস্ত হইলাম, ইহাই আমার দুঃখ। কৃপা করিয়া বলিয়া দিন, মনকে বশীভূত করিবার কোন উপায় আছে কি না।

বশিষ্ঠদেব মনে মনে ভাবিলেন—ভগবন্! তোমার

আজ এ কি অপূর্ব্ব লীলা! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপদেষ্টা, আজ তুমি উপদেশ লাভের জন্য নগণ্য, কীটানুকীট, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বশিষ্ঠের আশ্রম দ্বারস্থ! বিশ্বসৃক, সর্ব্বনিয়ন্তা, ভগবন্নারায়ণ, মনকে কি প্রকারে জয় করা যাইতে পারে, সেই উপায়, সেই মন্ত্র গ্রহণাভিলাষী হইয়া, আজ মায়ামুগ্ধ, অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন বশিষ্ঠের আশ্রম দ্বারস্থ! জ্ঞানময়, জ্ঞানাতীত, জ্ঞানপিপাসু হইয়া, ঘোর অজ্ঞানীর নিকট আজ নতশির, যুক্তপাণি! আজ জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিকণা প্রাপ্তি কামনায় খদ্যোতের কৃপাভিলাষী! প্রভো! ধন্য তোমার দয়া, ধন্য তোমার শিক্ষা প্রদানের প্রণালী! তুমি আত্মবিস্মৃত। আত্মবিস্মৃতি ঘটিলে—অহমিকা বুদ্ধি বিলুপ্তা হইলে, গুরুলঘু-জ্ঞান, ভেদবোধ থাকে না, জগতে আজ এই শিক্ষা প্রচার করিয়া দিলে।

বশিষ্ঠদেবকে চিন্তাকুল দেখিয়া, চিন্তামণি জিজ্ঞাসা করিলেন—গুরো! কি ভাবিতেছেন? মনকে জয় করিবার কোন উপায় কি নাই? মনের নিকট আমি কি তবে পরাজয় হইব?

বশিষ্ঠদেব বলিলেন—বৎস রাম, কোন চিন্তা নাই। তোমার পরাজয় কখনও কাহারও নিকট হইতে পারে না। তুমি সর্ব্ববিজয়ী, বিশ্ববিজয়ী—তুমি সর্ব্বশক্তিমান। মনকে জয় করা অতি সহজ, অনায়াসসাধ্য—ইচ্ছা করিলেই জয় করিতে পার। মন অনর্থকারিণী যখন যাহা করিতে

বলিবে, করিও না। প্রশ্রয় দিলেই প্রমাদ, সংযমেই সুখ।

মনাগভ্যুদিতৈবেচ্ছা ছেত্তব্যানর্থকারিণী।

অসংবেদন শস্ত্রেণ বিষস্যেবাঙ্কুরাবলী ॥

(যোগবাশিষ্ঠ)

বিষবৃক্ষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইবা মাত্র লোকে যেমন তাহাকে ছেদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনর্থকারিণী ইচ্ছার অঙ্কুর মাত্র মনে উদয় হইলে, অননুভূতি অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে নির্ম্মূল করিবে।

অস্থির, চঞ্চল মন স্থির, শান্ত হইলে,—শ্রদ্ধা, অভ্যাস, বৈরাগ্য, সংযমের পথে নিয়ত বিচরণ করিলে, বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, নির্ম্মল, প্রফুল্ল হয়। প্রজ্ঞা তখন প্রতিষ্ঠিতা, বুদ্ধি তখন নিশ্চলা, ভক্তি তখন অচলা হয়। তখন মনে হয়, চিত্তে ধারণা হয়—জীবের জড়দেহ, দেহমধ্যগত সূক্ষ্মদেহের বহিরাবরণ মাত্র—এই নিখিল সংসার, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মতর অধ্যাত্মজগতের বহিরাচ্ছাদন মাত্র—ইহা সেই আত্মসত্তার জ্যোতি, বিকাশ, নামরূপ মাত্র। তখন পদার্থ মাত্রই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া চিত্তে প্রতিভাত হয়;—নিখিল জগৎ—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আকাশ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, জীবপূর্ণ এই সপ্তলোক—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন ব্রহ্মময় বলিয়া চিত্তে উদ্ভাষিত হয়। তখন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয়ের মধ্যে দেখিতেপাই তাঁহাকে; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের মধ্যে

দেখিতে পাই তাঁহাকে; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় বা শক্তির মধ্যে দেখিতে পাই তাঁহাকে; কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ষড় রিপুর মধ্যে দেখিতে পাই তাঁহাকে; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম পঞ্চমহাভূতে দেখিতে পাই তাঁহাকে; ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলের মধ্যে দেখিতে পাই তাঁহাকে; জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির মধ্যে দেখিতে পাই তাঁহাকে; দ্বাদশ মাস, ষড় ঋতু, অনন্ত কালের মধ্যে দেখিতে পাই তাঁহাকে; চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, আলোক অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাই তাঁহাকে; পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী, জায়া পুত্রাদির মধ্যে দেখিতে পাই তাঁহাকে; ইহলোক পরলোকের মধ্যে দেখিতে পাই তাঁহাকে; সূতিকাগৃহ, পথ, শ্মশানভূমিতে দেখিতে পাই তাঁহাকে; জড় চৈতন্য, সূক্ষ্ম স্থূল, ব্যষ্টি সমষ্টি, ব্যবহারিক পারমার্থিকের মধ্যে দেখিতে পাই তাঁহাকে; কার্য্যকারণ, ব্যক্ত অব্যক্ত, সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ, জন্ম-জীবন-মৃত্যুর মধ্যে দেখিতে পাই তাঁহাকে। দ্বৈতবোধ, ভেদবুদ্ধি, ভিন্নতাজ্ঞান তখন তিরোহিত হয়—তখন আত্মদর্শন, ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হয়। ইহাই ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ—ইহাই মুক্তি।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।